মিথ্যারও শেষ আছে

অদ্রীশ বর্ধন

মিথ্যারও শেষ আছে

অদ্রীশ বর্ধন

সত্যের ডালপালা নেই। মিথ্যের আছে। একটা মিথ্যা ঢাকতে অনেক মিথ্যের ডালপালা দরকার হয়।

অথচ সাসপেক্ট মিথ্যে বলে। সেই মিথ্যে ঢাকতে রাশি রাশি মিথ্যে আমদানি করে। সত্যান্বেষীকে তখন খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজতে হয়, সেই ছুঁচ দিয়ে সাসপেক্টের অপরাধ গেঁথে ফেলতে হয়। সে বড় বুদ্ধির কাজ।

গোয়েন্দারা এই কারণেই বুদ্ধিজীবী। এই বুদ্ধির চর্চা করতে করতে বড় খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর জয়ন্ত চৌধুরী। প্রথমজনের কাছে এটা নেশা। দ্বিতীয়জনের কাছে পেশা। ইন্দ্রনাথ শখের গোয়েন্দা। জয়ন্ত পুলিস গোয়েন্দা। এই রাজ্য ক্রিমিন্যালদের স্বর্গভূমি হয়ে ওঠার পর যে স্পেশ্যাল সেল তৈরি করা হয়েছে কূট কেসের সমাধানের জন্যে— জয়ন্ত তার কর্ণধার। কিন্তু একা যায় না সঙ্কট সমাধানে— সঙ্গে থাকে অশনি-প্রতিম ইন্দ্রনাথ। কর্তৃপক্ষ তা জানেন। কিন্তু চুপ করে থাকেন। দুর্জন দমন তাঁদের লক্ষ্য। কোনও বুদ্ধিজীবী যদি তার বুদ্ধি ধার দেয় বিনা প্রত্যাশায়, ক্ষতি কী?

অস্টিন গাড়িতে ডেড বডি পাওয়ার পর মিথ্যের ডালপালা যখন ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সত্যের খোঁজে, সূত্রের খোঁজে এরা দুজনে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিল। ওদের আমি রহস্য-বন্ধু বলি এই কারণেই। প্রহেলিকার পোকা।

আমিও সেই জীব। নইলে দুজনের কালঘাম ছুটে যাওয়ার কাহিনী লিখতে বসব কেন?

ইন্দ্রনাথ ঘর ছেড়ে বেরতে চায় না। বেলেঘাটায় সুভাষ সরোবরের ধারে জোর করে বাড়িটা বানিয়ে দিয়েছিল আমার প্রাণসখী অর্ধাঙ্গিনী। তার আগে ছিল মেসে। সেখানে ওর ভাল লাগত না। এ ধরনের মানুষদের প্রাণের মানুষ তেমন কেউ থাকে না। ওর যে জগতে দিবানিশি অবস্থান, সে জগতে বিচরণের যোগ্য মানুষ বিরল বলেই .

এরা হয় বন্ধুহীন। ইন্দ্রনাথেরও তাই হয়েছিল, মনের দিক দিয়ে একা। পরিচিত ব্যক্তি অগণন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি ওকে আরও একক করে তুলেছিল।

তা বুঝেই আমি আর আমার জন্মজন্মান্তরের সঙ্গিনী কবিতা প্রতি রবিবারে বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা যেতাম। ব্যাচেলর গোয়েন্দা ঠাকুরপোর পেছনে লাগত কবিতা। রান্নাবান্না করত। আড্ডা মারতাম। একটা দিন হইহই করে কাটিয়ে দিতাম।

জয়ন্ত আসত এই আড্ডার আসরে ফাঁক পেলেই। ওকে আমরা পুলিস-রতন জয়ন্ত বলে ডাকতাম। নামটা দিয়েছিল কবিতা। ইন্দ্রনাথকে বলত ক্যারেকটারলেস। যেহেতু ও অজস্র কঠিন কটাক্ষ-তীর এড়িয়েছে, জবা-রাগ ধরা বহু অধরের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, দুই গালে মোহন-টোল ফেলেও ওকে জয় করা যায়নি, পরী হোক কি কিন্নরী হোক— ইন্দ্রনাথ নিরাসক্ত। এহেন শিবকে ক্রমাগত খুঁচিয়েই যায় কবিতা। মহীধর হিমালয়ের মতোই অনড় থেকে যায় ইন্দ্রনাথ।

ভীম-কলেবর হয় শুধু তখন, যখন জটিল রহস্যের জালে জড়িয়ে কেউ দৌড়ে আসে।

এক বড়দিনের ছুটিতে পুলিস-রতন জয়ন্ত এসেছিল আড্ডা জমাতে। ছুটির দিন বলে ভালমন্দ রেঁধেছিল কবিতা। খাওয়ার আগে আমরা চারজনে মিথ্যা-বিদ্যা নিয়ে চুটিয়ে গল্প করেছিলাম। 'কয়লা ভাঙার হাতুড়ি' কেস মিথ্যের জটাজাল মেলে ধরে কিভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল দুই রহস্য-বন্ধুকে, তা শুনেছিলাম। অপূর্ব প্রশ্নমালায় ওরা কিভাবে মিথ্যের মরীচিকা ভেদ করে সত্যকে আবিষ্কার করেছিল, কিভাবে শেষ পর্যন্ত মানিকজোড় মিথ্যেবাদী দুই মার্জারার শ্রীঘরে গিয়েছিল কঠিন-কোমল বিচারপতির সূক্ষ্ম দণ্ডাদেশে— তা শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।

গল্পে মজে গেলে বাঙালি মাত্রই খাওয়ার কথা ভুলে যায়। আমাদেরও সেই দশা হয়েছিল, শুনেছিলাম যত রাজ্যের মিথ্যে বলার কাহিনী। জয়ন্ত সব জায়গায় মন খুলে কথা বলতে পারে না। আড্ডার আসরে সেই রাতে মনের ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছিল, মিথ্যে। মিথ্যে। মিথ্যে। অথচ, সূত্র কোথাও না কোথাও থাকে। সযত্নে লুকিয়ে রাখে মিথ্যেবাদী সাসপেক্ট।

এই রকমই এক চ্যাম্পিয়ন মিথ্যেবাদীর কেস এসে হাজির হয়েছিল সেই রাতে।

রাত হয়ে গিয়েছিল। বছরের সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডার রাত হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

ইন্দ্রনাথ বললে— "জয়ন্ত, যুগল খঞ্জন পাখি তো এখুনি উড়ে যাবে, তুই আজ রাতটা এখানে থেকে যা।"

টেলিফোনটা এল ওরা দুজনে যখন ঘুমে অচেতন— তখন।

গোটা কলকাতা সারা রাত হুল্লোড় করেছে। ভোরের দিকে ঝিমিয়ে পড়েছে। বছরের এই কটা রাত কর্তৃপক্ষ রাশ আলগা দেয়। আরক্ষাবাহিনী কিন্তু সজাগ থাকে। তাদের কাজ বাড়ে। যেখানে মধুশালা, সেখানেই মধু-পরিচয়। সেখানেই নগর-নাগরী। বনমালী-কেলি-কুঞ্জবন যত্রতত্র, তারপরেই, দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায়: 'মাতালে আমার বড় ভয়, রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর, ধূলামাখা কলেবর, জিহ্বায় জড়ানো কথা কয়, অকারণ চিৎকার, করে জোরে অনিবার, গর্দভ গণ্ডার অচেতন, কি জোর হাতুড়ি-হাতে, ভূমিকম্প মুষ্ট্যাঘাতে, পদাঘাতে বজ্র-নিপাতন, খানায় যখন পড়ে, আর নাহি

নড়েচড়ে, কালনিদ্রা আসে, নাক ডাকে, মধুচক্র হয় গালে...'।

মধুচক্র! গোটা কলকাতা, সল্টলেক আর শহরতলি এখন ছেয়ে গেছে মধুচক্রে। বসন্ত-কোকিল কণ্ঠ কোথায় নেই? সরস অধরে অর্ধেক চন্দ্রমা আর অতীব সুষমা নিয়ে এরা নেমে আসে বড়দিনের রাতের কলকাতায়... প্রণয়-নীড় তখন পথে পথে...

ফলে, পুলিস হিমশিম খেয়ে যায়।

তাই, জয়ন্ত অফিসে দিয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথের টেলিফোন নাম্বার। সেরকম উৎকট ব্যাপার কিছু ঘটলে যেন খবর দেওয়া হয়।

টেলিফোন বাজল ভোর পাঁচটায়।

ফোনটা করেছিল ডিউটি অফিসার।
পার্কিং করা একটা অস্টিন গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে এক বয়স্কা মহিলার মৃতদেহ। সন্দেহজনক অবস্থায়।

গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল একটা প্রশান্ত পথের ধারে। শহরতলিতে। পথ না বলে গলি বলা উচিত। নামটা গালভরা— কল্পনা-কানন লেন।
পথের শেষে রয়েছে 'কল্পনা-কানন' ভবন। একা। আশপাশে কোনও বাড়ি নেই।
রাস্তা ফাঁকা। কোনও সময়েই এই পথ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া বেশি যায় না। তবে পুলিসের টহলদার ভ্যানকে যেতে হয় এই পথ দিয়েই— এক জনবহুল অঞ্চল থেকে আর এক জনবহুল অঞ্চলে। যায় রাতে। যখন টহল দিতে শুরু করে নিশাচররা—
পর-পর কয়েক রাত রেডিও ভ্যান নিয়ে গেছেন সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ। শনিবার রাতে দেখেছিলেন, পার্ক করা রয়েছে একটা গাড়ি। কেউ নেই গাড়ির ভেতরে অথবা বাইরে।
খটকা লেগেছিল সার্জেন্টের। এরকম একটা নির্জন সরু রাস্তায় কেউ গাড়ি দাঁড় করায় না। করলেও, ধারে কাছে অন্তত থাকে। গাড়ি-যন্ত্র বিগড়োলে, এরকম হতে পারে।
কিন্তু গাড়ির কাছে কেউ নেই।
রাত বেশ হয়েছে। গাড়ি রেখে চালক গেল কোথায়?
বড়দিনের মরসুম শুরু হয়ে গেছে। প্রচুর গাড়ি চুরি হচ্ছে। যেখানে সেখানে ফেলে রেখে গাড়ি-চোর হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। ফেলে যাচ্ছে জনবিরল অঞ্চলে।
সেরকম কোনও কেস নয় তো?
কন্ট্রোল-রুমে ফোন করেছিলেন বিজয় সাধুখাঁ। গাড়ি খোয়া গেলে যাঁর কাছে কমপ্লেন যায়, তিনি টেলিফোন ধরেছিলেন।
কী গাড়ি?
অস্টিন ইলেভেন হাড্রেড।
কী রঙ?
ফিকে নীল।
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কী?
নাম্বার বলেছিলেন বিজয় সাধুখাঁ।
কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক?
পেছনের বাম্পার ঢিলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা।
না। এরকম কোনও গাড়ি চুরির খবর আসেনি।

সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ গাড়ি নিয়ে আর ভাবেননি। যার গাড়ি হারিয়েছে, তার যখন মাথাব্যথা নেই, তিনি কেন ভাবতে যাবেন?
একটা সম্ভাবনা অবশ্য মাথায় উঁকি দিয়েছিল।
বড়দিনের উন্মাদনা নিশ্চয় কোনও তরুণ তরুণীকে অস্থির করে তুলেছে। শহর থেকে এসেছে দূরে। গাড়ি ফেলে রেখে গেছে আরও দূরে। নির্জন মাঠে।
যাক। মদনের শরবিদ্ধ হলে মানুষ এরকম করে।
তাই বাগড়া দেননি সার্জেন্ট।
পরের রাতে টহল দিতে এলেন সেই রাস্তায়। জোরাল হেডলাইটের আলোয়... দেখলেন, ফিকে নীল রঙের অস্টিন ইলেভেন হাড্রেড তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

এবার ভ্যান থেকে নামলেন সার্জেন্ট। একা নন। সঙ্গে কুকুর। তার নাম র‍্যাডার।
কলকাতার ক্রিমিন্যালরা এখন শিকাগোর ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। বিজ্ঞান তাদের হাতে অজস্র উপকরণ তুলে দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদীরা অন্য রাজ্য থেকে তাড়া খেয়ে এসে গা-ঢাকা দিচ্ছে বিশাল এই শহরে। আর, শহরতলিতে। কোথায়, কখন, কিভাবে বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটাবে,— তা শুধু তারাই জানে।
তারপর, শুরু হবে প্রচার। বিভীষিকা। সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য।
পাল্লা দিতে হচ্ছে আধুনিক আরক্ষা বাহিনীকেও। সঙ্গে থাকে সারমেয়। ট্রেনিং-এর শান-পাথরে ঘষা তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়। সেই সঙ্গে কাজ করে অন্যান্য অজানা ইন্দ্রিয়। মানুষ টের পায় না— কুকুর ঠিক টের পায়।
র‍্যাডার সেই জাতের কুকুর।

অস্টিন ইলেভেন হাড্রেডকে কাছ থেকে দেখা দরকার।
এক চক্কর দিলেন সার্জেন্ট। প্রত্যেকটা দরজা খোলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। সব দরজাই লক করা।
টর্চের ফ্ল্যাশ মারলেন জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে। কেউ নেই।
টর্চের আলো ঠিকরে গেল একটা চাদরের ওপর। ধুলোমাখা। ময়লা।

রেডিও ভ্যানে ফিরে এলেন সার্জেন্ট।
ফের খবর নিলেন কন্ট্রোল রুমে।
না। নিখোঁজ গাড়ির লিস্টে অস্টিন ইলেভেন হাড্রেড-এর নাম্বার এখনও ওঠেনি।
মনটা খচ করে উঠেছিল সার্জেন্টের।
এই কনকনে ঠাণ্ডায় পর-পর দু-রাত একটা গাড়ি পড়ে রয়েছে পাণ্ডববর্জিত এই পথে?
গাড়ি খারাপ বলে? কিন্তু দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। নিয়মিত ধোয়ামোছা চালু গাড়ি। তেল চুঁইয়েও রাস্তায় পড়েনি।
এরকম গাড়ি রাস্তায় ফেলে রেখে কেউ তো চলে যায় না। গাড়ি পুত্র সমান। এভাবে পরিত্যক্ত হয় না। দু-রাত হিম ঠাণ্ডায় পড়ে থাকে না।
র‍্যাডার-এর সারমেয়-সত্তা কিছু টের পেয়েছে।
খচমচ করছে পেছনে। টান পড়েছে চেনে।
ভ্যান-এর সামনে বসে ভাবলেন সার্জেন্ট। গাড়িটাকে আর একবার দেখা দরকার। চারদিক থেকে। সঙ্গে থাকুক র‍্যাডার।
লম্বা চেন লাগালেন র‍্যাডারের বকলসে। যাতে অনেকটা জায়গার গন্ধ নিতে পারে।
নামলেন গাড়ি থেকে।

মিনিট দুয়েক চেনে হ্যাঁচকা টান মেরে মেরে মাটি শুঁকে গেল র‍্যাডার, গাড়ি থেকে তফাতে গেল। একটা কাঁটাঝোপ নিয়ে বিব্রত রইল কিছুক্ষণ। প্রত্যাশায় অধীর সার্জেন্ট শক্ত মুঠোয় ধরে রইলেন শেকল। কাঁটাঝোপ থেকে সরে এসে গাড়ির চারদিকের মাটি শুঁকে গেল তন্ময় হয়ে, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় সে বিব্রত নয়। হয়তো উপভোগ করছে হিমেল বাতাস।
কিন্তু থমকে গেল হঠাৎ। একদম নিথর। শুধু ঘাড় কাত করেছে। নাকের ডগা থিরথির করে কাঁপছে।
রসিকতা করেছিলেন সার্জেন্ট— 'গন্ধটা কিসের রে? ইঁদুরের, না, ছুঁচোর?'
জবাবে দু-বার কুত্তা-গর্জন ছেড়েছিল র‍্যাডার।

সার্জেন্টের জোকস-এর জবাব দিয়েছিল র‍্যাডার হাঁড়-কাঁপানো হুঙ্কার ছেড়ে।
পরক্ষণেই, ধেয়ে গিয়েছিল পরিত্যক্ত অস্টিনের সামনের দরজার দিকে। হ্যাঁচকা টানে টলে গিয়েছিলেন সার্জেন্ট। মুঠোয় পাকিয়ে শেকল ধরে না থাকলে ছিটকে বেরিয়ে যেত র‍্যাডার। ওর ইতর সত্তা টের পেয়েছে এমন কিছুর যা রয়েছে সার্জেন্টের নজরের বাইরে।
তাই ও এখন ক্ষিপ্ত। প্রায় বন্য। প্রকট হয়েছে দংষ্ট্রা। থাবার নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে সামনের দরজা। দরজা খুলতে চাইছে। দংষ্ট্রা কিছু বলতে চাইছে মানুষ-প্রভুকে। এই তার ইঙ্গিত।— খোলো দরজা!
দেখো কী আছে ভেতরে!
হাতের চেটোর গোড়া দিয়ে ধাক্কা মেরে কোয়ার্টার জানলা ঘুরিয়ে দিলেন সার্জেন্ট।

যখন হাত গলাচ্ছেন 'ডোর ক্যাচ' ধরবেন বলে, নাকে ভেসে এল একটা

দুর্গন্ধ। গা পাক দেওয়ার মতো বিশ্রী গন্ধ।
র‍্যাডার-এর নাকেও গেছে সেই বিবমিষা-জাগানো বিকট গন্ধ। ছিটকে গেছে খোলা কোয়ার্টার জানলার দিকে।
শেকলে টান মেরে সরিয়ে আনলেন সার্জেন্ট। একহাতে টেনে ধরে রেখে আর এক হাতে খুললেন দরজা।
দেখলেন সেই ধুলোমাখা ময়দা চাদরটা। সামনের প্যাসেঞ্জার সিট ঢেকে রেখে ঝুলে পড়েছে ড্যাশবোর্ডের নীচে।
তবে, নিছক ধুলো আর ময়লা নেই সেই চাদরে।
একটা কোণ ধরে তুললেন। দেখলেন, কেন রক্ত জমাট বেঁধেছে চাদরে।

চাদরের কোণ ছেড়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ। বৈদ্যুতিক মশাল তাঁকে যেটুকু দেখিয়েছে, তা যথেষ্ট। এ দৃশ্য সাধারণ মানুষের রক্ত জল করে দেয়। তিনি শুধু শিউরে উঠলেন।
পূতিগন্ধ অসহ্য। মাথা টেনে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রবল। এদিকে আকাশ কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে র‍্যাডার। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। বিষমাখা খড়গশ্রেণী যেন শোভা পায়! হাত থেকে চেন খসিয়ে নিয়ে গাড়ির ভেতরে ধেয়ে যেতে চাইছে। দেখতে চায়, কী আছে চাদরের তলায়।
তার শরীরে যেন এখন ঐরাবতের শক্তি। সার্জেন্ট পারছেন না তাকে ধরে রাখতে। তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে র‍্যাডার গাড়ির দিকে। অব্যাহত রয়েছে ভূধর কাঁপানো হুহুঙ্কার।
ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে এল ভ্যান থেকে। দুজনের মিলিত শক্তি দিয়ে রোখা গেল হঠাৎ-বন্য সারমেয়কে। এক হাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন সার্জেন্ট।
দৌড়লেন ভ্যানের দিকে।

ডাক্তার সঞ্চিতা দাস বড়দিন উদ্‌যাপন করেছিলেন অধিক রাত্রি পর্যন্ত। কিউবা-র স্পেশ্যাল সাদা রাম পান করেছিলেন। রাম মদিরা হয় লাল রঙের। সাদা হয় না। তাই কৌতূহল হয়েছিল। নিয়মভঙ্গও করেছিলেন। বড়দিনের রাতে।
পরিণাম, অঘোর নিদ্রা।
ভোর রাতে যেন কাকের কর্কশ ডাক শুনলেন কানের গোড়ায়। খাটের পাশে, ছোট টেবিল। সেখানে রয়েছে টুকটুকে লাল টেলিফোন। আর্তনাদ করে যাচ্ছে। সেই নিনাদকেই বায়স-কণ্ঠ ভ্রম করেছিলেন ডাক্তার সঞ্চিতা দাস।
লেপের তলা থেকে হাত বাড়ালেন। কিংশুকবর্ণ রিসিভারকে কানের গোড়ায় আনলেন। চোখ তখন বোজা ছিল।
চোখ খুলে গেল ইলেকট্রনিক শব্দ-প্রবাহ শুরু হতেই। উঠে বসলেন রিসিভার নামিয়ে রেখে।
ফোন করেছেন সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ। তাঁর ডায়েরিতে লেখা আছে, সবচেয়ে কাছের ডাক্তারের নাম আর টেলিফোন নাম্বার। পুলিস-লিস্টের ডাক্তার। তিনি একজন মহিলা। এই অন্ধকার ভোর রাতে তাঁকে ফোনে ডেকে পাঠানো সমীচীন কিনা, তা ভাবতে তিন সেকেণ্ড সময় নিয়েছিলেন সার্জেন্ট। তারপর বের করেছিলেন মোবাইল ফোন...

ডাক্তার সঞ্চিতা দাস যখন অস্টিন ইলেভেন হান্ড্রেড গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ভোর রাতের অন্ধকার ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে মোট চারটে হেড লাইটের আলোয়।
সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ করিৎকর্মা পুরুষ। ডাক্তারকে তলব করেই খবর দিয়েছিলেন স্থানীয় থানায়। সেখান থেকে ছুটে এসেছে জিপ।
গলিপথেই নিজের ফিয়াট দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ডাক্তার সঞ্চিতা দাস। একটু দূরে। তিনি ছিমছাম মানুষ। এক সময়ে মডেলিং করতেন। সেই ফিগার এখনও ধরে রেখেছেন। বিয়ে করেননি। করার ইচ্ছে নেই। কারণ, পুরুষ জাতটাকে উনি পামর মনে করেন। মেয়েদের দাসী বানিয়ে রাখে। এক সময়ে হাজার হাজার মেয়েকে হারেমে ঢুকিয়ে রাখত পামর নৃপতিরা।
কিন্তু ডাক্তার হয়ে দেখলেন, পুরুষদের হুকুম তাঁকে মানতে হচ্ছে। যেমন এই ভোর রাতে তাঁকে লেপের তলা থেকে বেরতে হল। একজন পুরুষ পুলিসের হুকুমে।
ডাক্তার সঞ্চিতা দাস ঈষৎ ক্ষিপ্ত এই কারণেই। গাড়িও রেখেছেন রক্তারক্তির জায়গা থেকে একটু দূরে। তিনি হেঁটে আসছেন দক্ষ মডেলের মতো ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে। তিনি সাংঘাতিক সুন্দরী নন, কিন্তু গ্ল্যামার আছে। তিনি টল, স্লিম। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাস। তাঁর শরীরময় ডিজাইন ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরের আঁকা নকশা, তাই এক সময়ে নুড মডেলিং করেছেন সহজভাবে।
এঁর দেহসুষমা নিয়ে এত কথা বলার কারণ আছে। তা পরে প্রকাশ পাবে।

ডাক্তার সঞ্চিতা দাস ধুলো-রাস্তায় হাঁটু পেতে বসে পড়েছেন। গাড়ির দরজা খোলা রয়েছে। হেড লাইটের আলো ভেতরে পড়ছে। উনি রক্তমাখা চাদর তুলে দেখছেন— তলায় কী আছে।
দুর্গন্ধে গা পাক দিচ্ছে না। কারণ, গাড়ির চারটে দরজাই খুলে দিয়েছিলেন সার্জেন্ট। কুয়াশায় ভারী বাতাস পচা গন্ধ বহন করে নিয়ে গেছে নিজের শরীরে। পবনের অনেক গুণ!
চাদর তোলার পর তবুও একটু গন্ধ পেয়েছিলেন ডাক্তার সঞ্চিতা দাস। ডাক্তার জীবনে এ গন্ধ গা-সওয়া। তাই নির্নিমেষে, নাক না সিঁটকিয়ে, চেয়ে রইলেন রক্ত মাংসের শূন্য পিঞ্জরটার দিকে...
স্পর্শও করলেন না।
এই কাকভোরে মড়া ছোঁওয়ার দরকার কী? তাঁকে ডাকা হয়েছে তো শুধু একটা কথা বলবার জন্যে।
শরীরের খাঁচা ছেড়ে প্রাণপাখি সত্যিই উড়ে গেছে কী? নাকি, এখনও মটকা মেরে রয়েছে।
আজব হলেও এরকম ঘটনা বিরল নয়। পুলিস যখন চুটিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে, 'মড়া' তখন মর্গের টেবিলে উঠে বসে জানতে চয়েছে— "কী ব্যাপার? এখানে কেন আমি?"
যা দেখবার, তা দেখা হয়ে গেছে। নখরে মুক্তা-ছটা দেখিয়ে চাদর ফেলে দিলেন ডাক্তার। শিরদাঁড়া সিধে করলেন। উঠে দাঁড়ালেন। একটু সরে এলেন। বাসী মড়ার কাছে দাঁড়ানো ঠিক নয়।
সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ মানুষটা তাঁর ছ-ফুট হাইট নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই অন্ধকারে তাঁর কাফ্রি কলেবর দেখে চমকে উঠলেন না ডাক্তার সঞ্চিতা দাস। মডেলিং লাইনে এরকম অবয়ব তিনি ঢের দেখেছেন।
নীরব জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন— 'ভদ্রমহিলা মারা গেছেন দুই থেকে তিনদিন আগে।"
জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে। সার্টিফিকেটে লিখবেন শুধু এইটুকু।
কিন্তু সার্জেন্ট যে আরও একটু সংবাদ চান। হেতু আছে বলেই চান।
তাই স্বভাব-কর্কশ স্বর মোলায়েম করলেন— যতটা সম্ভব।
বললেন— "কিভাবে?"
"মাথায় চোট।"
"ক'বার?"
"দুই থেকে তিন।"
"কী দিয়ে?"
"খুব শক্ত গোল মতো কিছু দিয়ে।"
"বাটনা বাটার নোড়া দিয়ে কি?"
"হতে পারে। কিন্তু এ পয়েন্টে রিপোর্ট দেবেন প্যাথলজিস্ট। আমি দেব শুধু—"
"ডেথ সার্টিফিকেট। থ্যাংকিউ ফর এক্সট্রা ইনফরমেশন।"
"এক্সট্রা ইনফরমেশন!"
"বাটনা বাটার নোড়া। একটু আগেই উদ্ধার করেছি ঝোপের মধ্যে থেকে।"

থানায় ফোন করেই র‍্যাডারকে নিয়ে ঝোপটার দিকে গেছিলেন সার্জেন্ট। চেনে টেনে রাখা যাচ্ছিল না তাকে। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী
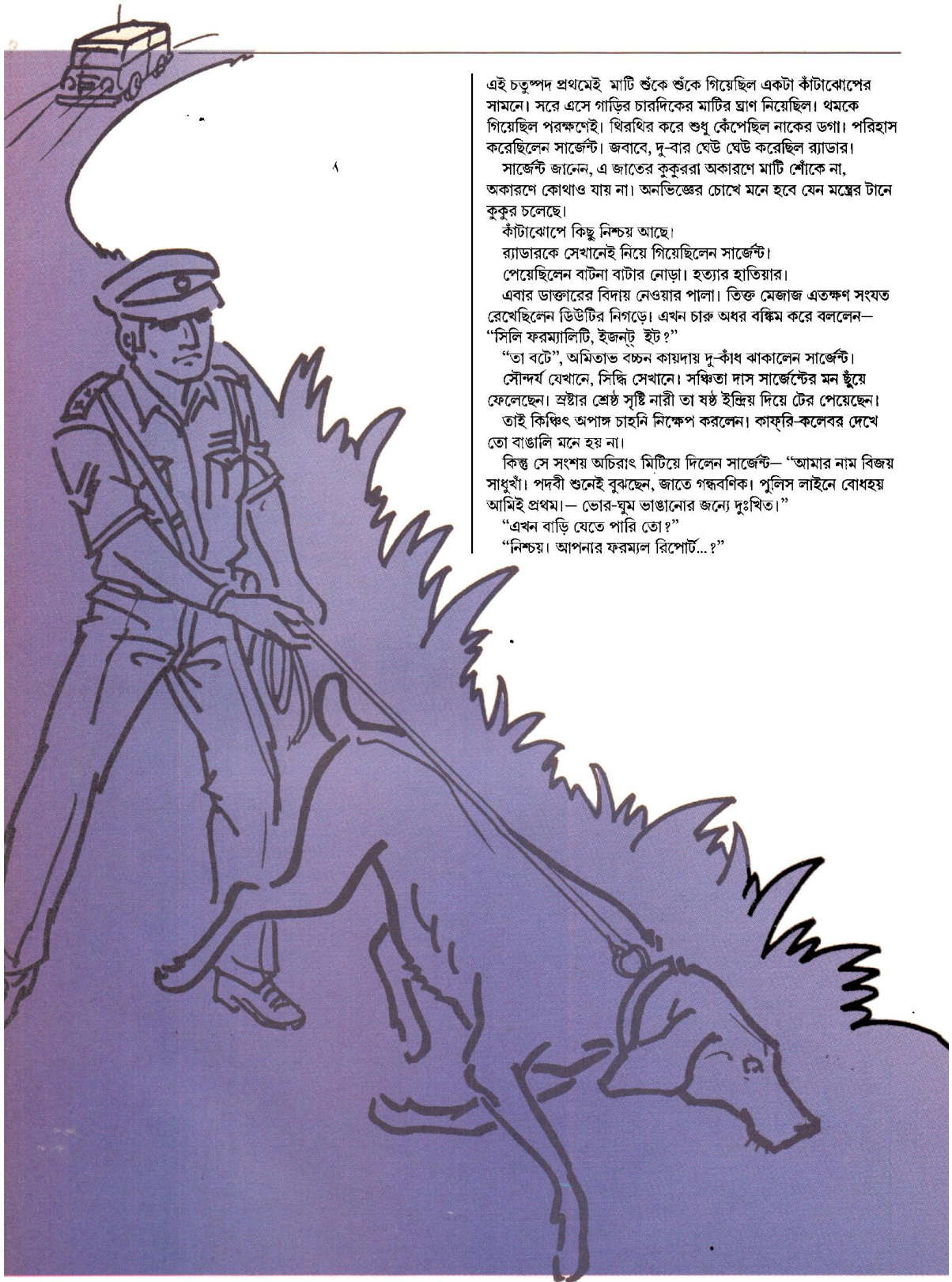
এই চতুষ্পদ প্রথমেই মাটি শুঁকে শুঁকে গিয়েছিল একটা কাঁটাঝোপের সামনে। সরে এসে গাড়ির চারদিকের মাটির ঘ্রাণ নিয়েছিল। থমকে গিয়েছিল পরক্ষণেই। থিরথির করে শুধু কেঁপেছিল নাকের ডগা। পরিহাস করেছিলেন সার্জেন্ট। জবাবে, দু-বার ঘেউ ঘেউ করেছিল র‍্যাডার।

সার্জেন্ট জানেন, এ জাতের কুকুররা অকারণে মাটি শোঁকে না, অকারণে কোথাও যায় না। অনভিজ্ঞের চোখে মনে হবে যেন মন্ত্রের টানে কুকুর চলেছে।

কাঁটাঝোপে কিছু নিশ্চয় আছে।

র‍্যাডারকে সেখানেই নিয়ে গিয়েছিলেন সার্জেন্ট।

পেয়েছিলেন বাটনা বাটার নোড়া। হত্যার হাতিয়ার।

এবার ডাক্তারের বিদায় নেওয়ার পালা। তিক্ত মেজাজ এতক্ষণ সংযত রেখেছিলেন ডিউটির নিগড়ে। এখন চারু অধর বঙ্কিম করে বললেন— "সিলি ফরম্যালিটি, ইজন্‌ট্ ইট?"

"তা বটে", অমিতাভ বচ্চন কায়দায় দু-কাঁধ ঝাকালেন সার্জেন্ট।

সৌন্দর্য যেখানে, সিদ্ধি সেখানে। সঞ্চিতা দাস সার্জেন্টের মন ছুঁয়ে ফেলেছেন। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নারী তা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেয়েছেন।

তাই কিঞ্চিৎ অপাঙ্গ চাহনি নিক্ষেপ করলেন। কাফ্‌রি-কলেবর দেখে তো বাঙালি মনে হয় না।

কিন্তু সে সংশয় অচিরাৎ মিটিয়ে দিলেন সার্জেন্ট— "আমার নাম বিজয় সাধুখাঁ। পদবী শুনেই বুঝছেন, জাতে গন্ধবণিক। পুলিস লাইনে বোধহয় আমিই প্রথম।— ভোর-ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত।"

"এখন বাড়ি যেতে পারি তো?"

"নিশ্চয়। আপনার ফরম্যল রিপোর্ট...?"

"আমার চেম্বার থেকে বিকেলে নিয়ে নেবেন। গুড মর্নিং।" একটা হাই চাপলেন সঞ্চিতা দাস। মডেলিং স্টেপে এগিয়ে গেলেন ফিয়াট গাড়ির দিকে।

পেছনে দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে থেকে পকেট থেকে পলিথিন প্যাকেটে মোড়া দুটো খাম বের করলেন সার্জেন্ট।

খাম দুটো পেয়েছেন ভদ্রমহিলার হ্যান্ড ব্যাগে।

সেইসঙ্গে একটা ঠিকানা।

ডিউটি অফিসারের ফোন এই পর্যন্তই জানিয়েছিল জয়ন্তকে।

বড় কর্তার ফোনটা এল তারপরেই।

"জয়ন্ত চৌধুরি?"

"গুডমর্নিং, স্যার। মেরি ক্রিস্টমাস।"

"মর্নিং। মেরি আর হল কোথায়?"

"এইমাত্র ফোন পেলাম ডিউটি অফিসারের।"

"ওটা আপনাকে ওয়াকিবহাল রাখার ফোন। অন্য অফিসারদের রুটিন তদন্তের পর যেতে পারেন— যদি ইচ্ছে করেন। আর যদি ইচ্ছে হয়—"

"ঘুম যখন ভেঙেছে, তাহলে এখুনিই যাই। আমিই কেস টেকআপ করছি। সঙ্গে থাকছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।"

একটু চুপ থেকে প্রসন্ন স্বরে বললেন বড় কর্তা— "আমাদের সৌভাগ্য।"

অস্টিন ইলেভেন হান্ড্রেড-এর পাশে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে জয়ন্ত আর ইন্দ্রনাথ। দুজনে দু-রকম বেশে। জয়ন্ত স্যুটেড বুটেড। ইন্দ্রনাথ শাল-মোড়া।

'বেবি অস্টিন' দিয়ে শুরু হয়েছিল অস্টিন মোটর কোম্পানি— জনগণের গাড়ি। ওজন ছিল মাত্র ৩৬০ কেজি। সেটা ছিল অস্টিন সেভেন।

এটা অস্টিন ইলেভেন হান্ড্রেড। ছোট্ট, ছিমছাম, মজবুত, পুরনো গাড়িকে পুরনো যুগের মানুষরা সত্যিই ভালবাসে। পরিবারের একজন ভাবে। বউ পুরান হলে যেমন বউ পালটানো যায় না, গাড়ি পুরান হল তেমনি গাড়ি পালটাতে চায় না। প্রেম যখন ক্ষীর হয়ে যায়।

এই গাড়ির মালিকও পুরান যুগের মানুষ। শূন্য দেহ পিঞ্জরের সর্বত্র বয়সের ছাপ। গৌরী। স্বাস্থ্যবতী। চৌকোণা চোয়ালে, ঠেলে বের করা থুতনিতে টিকোলো নাকে কর্তৃত্ব।

কিন্তু আভিজাত্য আছে। দামি লেফাফা তার প্রমাণ। বাঁ দিকে নীচের কোণে ছাপানো নাম আর ঠিকানা: অধিকারী, 'কল্পনা-কানন'। ইত্যাদি।

সার্জেন্ট বললেন— 'স্যার, বাড়িটা এই রাস্তার শেষে। বাড়ির নাম থেকেই হয়েছে রাস্তার নাম। খুব পুরনো বাড়ি।

"অধিকারী যখন নামের পদবী, ভদ্রমহিলা অবশ্যই মিসেস অধিকারী", জয়ন্তের প্রশ্ন।

ইন্দ্রনাথ বললে— "গিয়ে কড়া নাড়া যাক।"

বাড়ির নাম 'কল্পনা-কানন' যিনি দিয়েছিলেন, নিশ্চয় তিনি কল্পনা-প্রবণ মানুষ ছিলেন। বানিয়েছেন একতলা রম্য নিকেতন, ঘিরে রেখেছেন বিলাস-কানন দিয়ে, সেখানে শোভা পাচ্ছে অগণন মহীরুহ। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা চৌকোণা দিঘি পানাপুকুর হয়ে রয়েছে। দিঘি ঘিরে রয়েছে ফুল-বন। মালীর যত্ন না পাওয়ায় তা এখন প্রকৃতই পুষ্প-অরণ্য। গোটা বাগান-বাড়ি এক সময়ে ঘেরা ছিল চওড়া আর উঁচু পাঁচিল দিয়ে— এখন ইট খসে খসে পড়ছে। অভেদ্য দুর্গ আকারে নির্মিত বিলাস-কানন। এক সময়ে যা ছিল মণিময় নিকেতন, এখন তা জরাজীর্ণ ভবন। দেখলে কষ্ট হয়। বড় মানুষি করেছে এক পুরুষ— পরের প্রজন্মরা তার সমাদর করতে পারেনি। মোটা মোটা থাম টাউন হলের ছবি চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলে।

সিংহ-দ্বারে প্রস্তর-ফলকে লেখা 'কল্পনা-কানন'। তারপর পথ চলে গেছে সোজা একতলা বাড়িটার দিকে, পথের দু'পাশে শিমুল, বকুল, বট, অশ্বত্থ প্রমুখ গাছের তলায় তলায় পাথরের বেদি—বেদির পাশে দাঁড়িয়ে পাথরের সুরূপা রমণী নানা ভঙ্গিমায়— কাঁখে কলসি। মুখে হাসির আভা, নীরব আহ্বানে যেন বলতে চাইছে— এস, বোসো, পথিকবর, শোনো

কোকিল-সঙ্গীত, যেতে পারি তোমার সনে জলকেলি—রঙ্গে!
সত্যিই, এই কল্পনা-কানন একদা ছিল প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য-নিকেতন।

মহিলার প্রাণবধ করা যখন হয়েছে, তখন সঙ্গে একজন মহিলা পুলিস থাকা প্রয়োজন। স্মিতা সাহাকে এই কারণেই সঙ্গে নিয়েছিল জয়ন্ত, সার্জেন্ট ভদ্রলোক তাঁকে আনিয়ে রেখেছিলেন।

বিরাট দরজায় কলিংবেল টিপল এই স্মিতা সাহা।

ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রইল স্যুটেড বুটেড আর শাল-মোড়া বিপদ-নিস্তার বন্ধু-যুগল— আমি যাদের নাম দিয়েছি রহস্য-বন্ধু।

কলিংবেল টেপা হল পর-পর তিনবার— অনেকটা পাগলা-ঘন্টির কায়দায়— ভেতরের বাসিন্দারা যেন বুঝতে পারে, বিষয়টা গুরুতর, বিষয়টা জরুরী—শীতের সকাল বলে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে চলবে না।

তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকতে হল তিন মিনিট।

জয়ন্ত ওর নোটবই খুলে নামটায় ফের চোখ বুলিয়ে নিল, অধিকারী। অস্টিন ইলেভেন হান্ড্রেডে যাঁর করোটি চূর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই শ্রীমতী অধিকারী। সে গাড়ি এখন হিমে ভিজে গেছে, তিনদিন ধরেই হিমশীতল হয়ে তার মধ্যে রয়েছে কানন বেষ্টিত এই নিকেতনের অধিকারিণী— শ্রীমতী অধিকারী।

অথচ, তিনটে মিনিট কেটে গেল— কলিংবেলের উপর্যুপরি আর্তনাদ কাউকে সচকিত করল না। ঘুম এমনই জিনিস— বিশেষ করে শীতের ঘুম।

স্মিতা সাহা আবার কলিং বেলে আঙুল রেখেছিল।

দরজা খুলে গিয়েছিল ঠিক সেই সময়ে।

সামলে নিল স্মিতা সাহা। কেননা, ওর বাঁ হাত ছিল দরজার পাল্লায়, ডান হাতের আঙুল কলিং বেলের বোতামে। পাল্লা আচমকা খুলে যেতেই বাঁ হাত গিয়ে পড়ত ভদ্রলোকের মুখের ওপর।

বয়স তাঁর বেশি নয়। তিরিশের এদিক ওদিক। চোখে ঘুম জড়িয়ে রয়েছে। ফর্সা খড়গনাসা। ভোজালি গোঁফ। পাতলা চিবুক, ঠোঁট আর চোখ শক্ত সাতসকালে কলিং বেল বাজানোর জন্যে। গায়ে আলোয়ান। পরনে সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো জড়ানো।

শ্রীমতী অধিকারী অবশ্যই এঁর বামাঙ্গিনী নন। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। চুল পেকে গেছে, মুখের চামড়া লোল হয়েছে।

এই ভদ্রলোক নওজোয়ান। শ্রীমান অধিকারী হতে পারেন। অধিকারী বংশের নব-প্রজন্ম।

দুই চোখে একটা জিনিস অনুপস্থিত।

উদ্বেগ।

বাড়ির কর্ত্রীস্থানীয়া বৃদ্ধা দু-রাত বাড়ি ফেরেননি, সেজন্যে উৎকণ্ঠা মোটেই ঘনায়মান নয় এঁর দুই শক্ত চোখে।

বন্ধু-যুগলের মনে প্রথম খটকা লেগেছিল এই একটা কারণে। বাড়ির কুকুর হারিয়ে গেলেও লোকে এখন থানায় ছোটে। দু-দুটো রাত বাড়ির একটা মানুষ বাড়ি ফিরল না— ইনি ষোড়শোপচারে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছেন!

তোবা! তোবা!

ভারী গলায় জিজ্ঞেস করেছিল জয়ন্ত— "আপনি মিস্টার অধিকারী?"

"না।"

"আপনার নাম?"

'সুশোভন তালুকদার। আপনারা কে?"

তিনজনের কেউই পুলিসের উর্দি পরে নেই। সুতরাং, এ প্রশ্ন সঙ্গত।

জয়ন্ত বললে— "আমি পুলিস অফিসার।"

অবাক হলেন না ভদ্রলোক। ভয়ও পেলেন না। তিলমাত্র উদ্বেগ দেখালেন না। শুধু চেয়ে রইলেন। বিরক্ত চোখে।

জয়ন্ত বললে— "মিসেস অধিকারী এ বাড়িতে থাকেন?"

"এটা তাঁরই বাড়ি।"

"মিস্টার অধিকারী?"

তর্জনী তুলে শুধু আকাশ দেখালেন সুশোভন তালুকদার। যার সাদা মানে— পরলোকে।

জয়ন্তর প্রশ্ন— "আপনি?"

"পেইং গেস্ট।"

জয়ন্ত নিশ্চয় ধাক্কা খেয়েছিল। নইলে রসনা থেকে সরস্বতী বিদায় নিলেন কেন সেকেন্ড কয়েকের জন্যে?

সেই অবসরে ইন্দ্রনাথ বললে— "মিসেস অধিকারী তাহলে আপনার ল্যান্ডলেডি?"

"অবশ্যই।"

"উনি বাড়িতে আছেন?"

"না।"—

"কোথায়?"

"পুলিসের কাছে যখন গেছেন, এ প্রশ্নের জবাব পুলিস দেবে।"

ঢেঁটিয়া লোক— এই সুশোভন তালুকদার।

কড়া গলায় বললে জয়ন্ত— "কথা বলব কি চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে?"

"আসুন ভেতরে।"

সব সেকেলে বাগান বাড়ির মতোই এই বাড়ির গাড়ি-বারান্দার পরেই রেলিংঘেরা চওড়া বারান্দা। এখানে বসেই বিশাল বাগানের হাওয়া খাওয়া যায়, অরুণ-নয়ন আনন্দ-বিহঙ্গ কালো কোকিলের-কবিত্ব শোনা যায়, সরোবরের দৃশ্য দেখা যায়, কলসি-কাঁখে প্রস্তর-রমণীদেরও দেখা যায়।

প্রায় বিশ ফুট চওড়া এই বারান্দায় কারুকাজ করা পাথরের আসন ছিল কিছু দূর অন্তর। একটায় বসল দুই বন্ধু।

এই প্রথম ভদ্রতা দেখালেন নীরস সুশোভন তালুকদার— "চা খাবেন তো? যাই, করে আনি।"

জয়ন্ত বললে— "কাজের লোককে বলুন— আপনি বসুন।"

"কাজের লোক এ বাড়িতে নেই।"

"আপনি আর ল্যান্ডলেডি? শুধু দুজন থাকেন?"

"হ্যাঁ।"

"রান্নাবান্না? বাজারহাট?"

"ভাগাভাগি করে করি।"

স্মিতার দিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে— "আপনি যান। হেল্প করুন।"

সন্দেহ ঘনিয়েছিল জয়ন্তের মনে। তাই নজরছাড়া করতে চাইল না পেইং গেস্টকে।

নারী স্রষ্টার সেরা রহস্য।

কিন্তু মেয়ে-পুলিস হওয়ার বিড়ম্বনা অনেক।

স্মিতা সাহা তা বুঝল রান্নাঘরে গিয়ে।

গ্যাসের নরম আঁচে ফুটছিল কড়া চা। সুশোভন তালুকদার তাহলে কলিং বেল শুনে, ঘুম থেকে উঠে, চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে, তারপর দরজা খুলতে এসেছেন।

দু-রাত ল্যান্ডলেডি নেই বাড়িতে। সাত সকালে কলিং বেল যদি বাজে পর-পর তিনবার, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় একটাই: বাড়ির কর্ত্রী ফিরে এসেছেন, তিনি ক্লান্ত, তাঁর আর তর সইছে না।

সে ক্ষেত্রে ছুটে যাওয়া উচিত ছিল পেইং গেস্ট ভদ্রলোকের। বাড়িতে তিনি একা। দোর খোলার লোক আর নেই।

তাছাড়া, এত সকালে পর-পর তিনবার ঘণ্টাধ্বনি অস্বাভাবিক বইকি। ঘুম ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদযুগলে গতি সঞ্চার ঘটে।

কিন্তু সুশোভন তালুকদারের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। চায়ের জল বসিয়েছেন, গ্যাসে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়েছেন, কেটলিতে চা-চিনি-দুধ দিয়েছেন— তারপর করিডর বেয়ে গিয়ে দরজা খুলেছেন। শক্ত চোখে, বিরক্ত মুখে।

এখন সেই করিডর বেয়েই তিনি গেলেন রান্নাঘরে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাতের সুভদ্র ইঙ্গিতে স্মিতা সাহাকে ভেতরে প্রবেশের আহ্বান জানালেন। নিজে কাপে চা ঢেলে স্মিতা সাহার হাতে তুলে দিলেন।

আর ঠিক তখনই সপ্রশংস নয়নে স্মিতাকে নিরীক্ষণ করে নিলেন।

বললেন— "আপনাকে পুলিস বলে মনে হয় না।"

সুশোভন তালুকদার লেডি-কিলার। নারী সত্তা দিয়ে নিমেষে বুঝে নিল

স্মিতা।
অক্ষি-তারকাও স্থির হয়ে গেছিল। সেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়েছিল।
তাতে টলে যাননি সুশোভন তালুকদার। জিজ্ঞেস করেছিলেন— "ব্যাপারটা কী নিয়ে?"
"মিসেস অধিকারীকে নিয়ে।"
"পুলিসের দ্বারস্থ হলেন তাহলে?" নিছক কৌতূহল, তার বেশি নয়।
নাকি তাও নয়? হয়তো অভিনয়।
স্মিতা জিজ্ঞেস করেছিল— 'পুলিসের কাছে যাওয়ার কারণ ঘটেছিল?"
"ঘটলেও আমার জানা নেই।" হেঁয়ালির জবাব। কিন্তু অম্লান রয়েছে কণ্ঠস্বরের কৌতূহল— "মিসেস অধিকারীর খবর কী?"
"মারা গেছেন।"
"আ-চ্ছা।" কৌতূহল এখনও রয়েছে। অন্য কৌতূহল, চেনা-জানা কারও মৃত্যু-সংবাদ কৌতূহলে যে উদ্বেগের ছায়া এনে দেয়— তা নেই।
পুলিস হলেও স্মিতা নারী। দারুনির্মিত নয়, তাই অবাক হয়েছিল— "সুসম্পর্ক ছিল?"
"দু-বছর ধরে তো আছি।"
"স্রেফ পেইং গেস্ট হিসেবে?"
প্রশ্নটার খোঁচা ধরে ফেললেন সুশোভন তালুকদার, কিন্তু গায়ে মাখলেন না। শুধু একটু হাসলেন— "তা তো বটেই। আমার ডবল বয়সী। কিন্তু আপনি নন।"
স্মিতার ঘাড়ের রোম শিরশির করে উঠেছিল এই জবাবে।
কিন্তু ফ্লার্ট করবার সময় তো এটা নয়, তার দরকার ইনফরমেশন। যেটুকু ঝুড়িতে জমেছে, সেইটুকুই আগে জয়ন্ত চৌধুরীকে দেওয়া যাক।
টাস্ক-ফোর্সের অধিনায়ক তিনি।

প্লেটে চা-বিস্কুট স্মিতা-ই নিয়ে এল বারান্দায়। পেছনে সুশোভন তালুকদার।
স্মিতার নারীসত্তা চঞ্চল হয়েছিল। মনের দর্পণ চোখে তা প্রতিফলিত হচ্ছিল।
চক্ষুষ্মান ইন্দ্রনাথ তাই সুমিষ্ট প্রশ্ন করেছিল— "চা করতে এত সময় লাগে?"
ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।
ধরিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্রনাথ। চোখে চোখে চেয়েই তা বুঝে নিয়েছিল স্মিতা, গোয়েন্দানি সে অকারণে হয়নি।
তাই চোখে চোখে চেয়েই নীরব ভাষায় বলেছিল— এখন থাক।
বারান্দায় পাতা ভারী আসন সরিয়ে বসা সম্ভব নয়। একাসনে ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্তের পাশে বসাও সম্ভব নয় সুশোভনবাবুর। তাই তিনি একটা কাষ্ঠাসন বহন করে আনলেন ভেতর ঘর থেকে।
ওইটুকু সময়ের মধ্যেই দু-চার কথায় স্মিতা সাহা ফিসফিস করে রহস্য-বন্ধু যুগলকে জানিয়ে দিল রান্নাঘরে পাওয়া ইনফরমেশন। এমনকি পুলিস-মেয়ের সঙ্গে পেয়িং গেস্টের ঘনিষ্ঠতা জমানোর প্রচেষ্টাও।
চৈনিক মুখে শুনল জয়ন্ত। সে যে বস। চোখের তারা নাচল ইন্দ্রনাথের। কারণ সে কৌশলে রুক্মিণীনাথ। শ্রীকৃষ্ণ।
চেয়ার নিয়ে দুই বন্ধুর সামনে বসলেন সুশোভনবাবু।

প্রথম প্রশ্নটা করেছিল ইন্দ্রনাথ—
'ল্যান্ড লেডিকে শেষ কবে দেখেছেন?'
ক্রিস্টমাস ইভে।
বড়দিনের আগের দিন?"
"হ্যাঁ।"
"আপনাদের মধ্যে উপহার বিনিময় ঘটেছিল?"..
"না। তবে, একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খেয়েছিলাম।..
'বাড়িতে? না, হোটেলে?'
"বাড়িতে।"
"খাওয়ার পর কী করলেন?..
"ওঁর সঙ্গে গাড়িতে বেরলাম।"
"কী গাড়িতে?"
"ফিকে নীল রঙের অস্টিন ইলেভেন হান্ড্রেড।"
"ওল্ড মডেল। কোনও মার্ক আছে? দেখলেই যাতে চেনা যায়— গাড়ি কার?"
একটু ভাবলেন সুশোভনবাবু— "পেছনের বাম্পার নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। গাড়ি মিসেস অধিকারীর।"
এই গাড়িই পড়ে আছে দু-দুটো রাত 'কল্পনা-কানন' থেকে একটু দূরে। সুশোভনবাবু তা জানেন না? কথায় অথবা মুখের ভাবে তা প্রকাশ পাচ্ছে না।
"শেষ কখন দেখেছেন মিসেস অধিকারীকে?" ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।
"দুপুর দেড়টার সময়ে।"
"কোথায়?"
"বার-এর সামনে।"
"আপনি গিয়েছিলেন, না, উনি গেছিলেন?"
"আমি গিয়েছিলাম, একটু মদ্যপান করার ইচ্ছে হয়েছিল। উনি আমাকে বার-এ নামিয়ে দিলেন?"
"তারপর কোথায় গেলেন?"
"আমাকে তা বলেননি। তবে ভাবছিলেন, ছোট বোনের কাছে যাবেন।"
খুবই স্বাভাবিক। কলকাতার পুরনো ফ্যামিলিতে এই বড়দিন ব্যাপারটা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়— খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে— বেড়ানোর ব্যাপারে। মন উড়ু উড়ু হয়— বাড়িতে মন টেকে না। বোনের কাছে যাওয়া স্বাভাবিক— পেইং গেস্টের সঙ্গে নিরানন্দ এই বিজন ভবনে থাকার চাইতে।
"বোনের ঠিকানা?"
"তা তো জানি না।"
"নাম? জানেন তো? যাবার সময়ে নিশ্চয় বলেছিলেন?"
"অদ্রিকা।"
"অদ্রিকা কী?"
"জানি না।"
আশ্চর্য মানুষ বটে এই সুশোভন তালুকদার। কৌতূহল নেই কোনও ব্যাপারেই। আদিম কাল থেকে কৌতূহল নামক চৌম্বক-শক্তি মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে জ্ঞানের পথে... এখনও যাচ্ছে...
কিন্তু এই ভদ্রলোক এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। ল্যান্ড লেডির মৃত্যু সংবাদ শুনে কৌতূহলহীন। ল্যান্ড লেডির সহোদরার পুরো নাম জানার ব্যাপারেও কৌতূহলহীন। বিচিত্র পুরুষ। অস্বাভাবিকও বটে।
এতই যখন কৌতূহলহীন, তখন আর একটা ব্যাপারে নির্বিকার থাকতে পারেন কিনা দেখা যাক।
অন্তর্বাণ নিক্ষেপ করল ইন্দ্রনাথ— কুবের যে-অস্ত্র পেয়েছিলেন অর্জুনের কাছ থেকে— অবশ্য প্রশ্নের আকারে।
"মিসেস অধিকারীর ঘর তল্লাশি করা যাক। ঘরটা কোথায়?"
এইবার.., এইবার চমকে উঠলেন হিমাচল সুশোভন।
শশব্যস্ত হলেন— "সেকী! ওঁর জিনিসপত্র হাঁটকাবেন নাকি?"
"হাঁটকাতে তো হবেই," সুশোভনের চমকিত মুখচ্ছবি পর্যবেক্ষণের মধ্যে রেখে অমায়িক স্বরে যোগ করল ইন্দ্রনাথ— "যখন উনি বেঁচে নেই।"

ইন্দ্রনাথ কিন্তু উঠল না পাথরের আসন ছেড়ে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে— কান পেতে শুনছে। যদিও বনবাদাড় হতে চলেছে এতবড় উদ্যান— তবুও বিষাদ কাটাতে বিটপ শ্রেণীর সমকক্ষ কিছু নেই। পাদপকুলের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার হদিশ মানুষ এখনও পায়নি।
রেড ইন্ডিয়ানদের মতো বড় বড় গাছের কাছে থেকে মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করছিল ইন্দ্রনাথ।
করিডরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। ফিরে আসছে তিনজনে। শ্রীমতী অধিকারীর সহোদরার ঠিকানা পাওয়া গেছে।
তাঁর নাম, মিসেস অদ্রিকা বটব্যাল।

ইন্দ্রনাথ বললে— "জয়ন্ত, মিসেস অদ্রিকা বটব্যাল যখন কলকাতার মধ্যেই থাকেন, তখন তাঁকে এখুনি আনা যাক— ডেড বডি আইডেনটিফাই করার জন্যে। মিস স্মিতা সাহা গেলে ভাল হয়।"

"তাহলে ওঠা যাক।"

"মিস সাহা আগে থানায় নিয়ে যাক সুশোভনবাবুকে— কিছু কথাবার্তা তো ওখানেই হবে—"

"তা তো বটেই।" জয়ন্তও তাই চায়। পেট থেকে কথা বের করতে হলে থানার মতো জায়গা নেই।— "সুশোভনবাবু, আপনি জামা-টামা পরে আসুন।"

একটা কথাও না বলে প্রস্থান করলেন সুশোভন তালুকদার।

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল স্মিতাকে—"কী হয়েছিল রান্নাঘরে?"

খুলে বলল স্মিতা। ইন্দ্রনাথের মধ্যে এই একটা গুণ আছে। মেয়েদের মনের দরজা খুলে দিতে পারে। ওকে বিশ্বাস করা যায়। ওর সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়।

জয়ন্ত চেয়ে রইল অন্য দিকে। সে যে বস।

ইন্দ্রনাথ আস্তে বললে— "আঁচ করেছিলাম। তাই বললাম, আপনি ওঁকে নিয়ে যাবেন থানায়। যাবার সময়ে ঘনিষ্ঠ হবেন। মানে, অভিনয় করবেন। পারবেন?"

মুচকি হেসে স্মিতা বললে— "চোখের কোপ মেরে জানতে হবে, শ্রীমতী অধিকারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা, এই তো? কিন্তু বয়স তো ডবল।"

"এই সমাজে এখন অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে।"—

করিডরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ চেয়ে রইল বাগানের দিকে।

স্মিতা করিডরের দিকে। সুশোভনবাবু সাদা শার্টের ওপর ফুলহাতা ব্লু সোয়েটার পরে বেরিয়ে আসতেই হেসে বললে— "বিলগেটস-এর ড্রেস পরেছেন দেখছি।"

"বিল গেটস!" থমকে গেলেন সুশোভনবাবু।

তারিফ-ঝরানো চোখে স্মিতা বললে— 'সফটওয়্যার কিংবদন্তি। তিনি তো নেভি-ব্লু 'ভি' কাট ফুলহাতা সোয়েটার ছাড়া পরেন না। ওয়ার্ল্ডের সমস্ত ইয়ং সফটওয়্যার প্রফেশন্যাল এইরকম সোয়েটার পরে বিল গেটস হতে চায়।— আপনি কি সফটওয়্যার প্রফেশন্যাল?

রহস্য-বন্ধু যুগলকে চমকে দিয়ে সুশোভন বললেন— "হ্যাঁ।"

হেসে হেসে কথা বলতে বলতে পুলিস-মেয়ে স্মিতা বাগানের পথ দিয়ে সুশোভন তালুকদারকে নিয়ে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে। দু-পাশে মৃগ-নয়না প্রস্তর-অবয়বী কামিনীরা যেন নীরব অট্টহাসি হেসে গেল রঙ্গ দেখে।

জয়ন্ত বললে— "তোর মতলব কী?"

"একটা জিনিস এ-বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে কিনা দেখতে চাই।"

অপলকে চেয়ে থেকে জয়ন্ত বললে— "বাটনা বাটার নোড়া?"

"হ্যাঁ।"

কিন্তু রান্নাঘরে নোড়া রয়েছে দাঁড় করানো শিলের গা ঘেঁষে। সম্প্রতি ধুয়ে রাখা হয়েছিল, নোড়ার তলা তাই এখনও ভিজে ভিজে। কাদাটে।

জয়ন্ত বললে— "অনেক বাড়িতে দুটো নোড়া থাকে, দুটো শিল থাকে। এ বাড়িতে নেই তো?...

"দেখা যাক।"

কিন্তু গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করেও খুঁজেও নোড়াহীন শিল পাওয়া গেল না। নেই গুদোম ঘরে, নেই ছাদে, নেই বাগানের আস্তাকুঁড়ে।

বিশাল বাগানের দিকে রইল ইন্দ্রনাথ। যা এখন জঙ্গল। এখানে কোথাও যদি একটা শিল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, অথবা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়— মানুষ তা খুঁজে পাবে না।

পেতে পারে বাঘা কুকুর।

র‍্যাডার।

ফটোগ্রাফার আর ফোরেনসিক ল্যাবোরেটরির এক্সপার্টরা এসে গেছে। তাদের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু আসেননি প্যাথলজিস্ট। তিনি ডেড বডি দেখবেন তাঁর জায়গায় বসে। এখানে আসেননি বৃষ্টি আসছে বলে। তাই গাড়ি শুদ্ধ ডেডবডি নিয়ে যেতে বলেছেন। তাহলে বলতে পারবেন, খুন গাড়ির মধ্যে হয়েছে, না, গাড়ির ভেতরে হয়েছে।

সার্জেন্ট ছিলেন জয়ন্তের হুকুমের প্রতীক্ষায়।

গাড়ি আগে নিয়ে গেলেন। ভেতরে রইল ডেডবডি। সেখান থেকে প্যাথলজিস্টের কাছে।

স্মিতা যে ছোট্ট অভিনয়টুকু করেছিল গাড়ির মধ্যে সুশোভনবাবুকে পাশে বসিয়ে, এবার তা বলা যাক।

স্মিতা বলছে, আড়চোখে তাকিয়ে— 'রিঙ্কল-ফ্রি হোয়াইট শার্ট, নেভি-ব্লু ভি-কাট ফুলস্লিভ সোয়েটার, কপালের অর্ধেক চুলে ঢাকা— অবিকল বিল গেটস।'

সুশোভন বললেন— "তাঁতের শাড়িতে বিচিত্রপুরী প্যাচের সঙ্গে আঁচলে জগন্নাথের মুখ পেন্ট করা, আপনি ডিজাইনার হলে পারতেন।"

"আমার স্বপ্ন কিন্তু মাল্টিমিডিয়া আর ওয়েব ডিজাইনিং।"

"রিয়্যালি! আমার জগৎ সফটওয়্যার। কমপিউটার যদি আপনার নেশা তো পুলিস লাইনে এলেন কেন?"

"কমপিউটার ডিপার্টমেন্টেই যে চাকরির শুরু। গোয়েন্দা জীবনে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়। যেমন আপনি।"

"কতখানি আশ্চর্য?"

"পুরোটাই। সফটওয়্যার প্রফেশনাল যখন, বছরে লাখ তিনেক আপনার রোজগার? ইন্টারনেট গার্ল এসে লিভ-টুগেদার চালিয়ে যেতে পারত আপনার সঙ্গে। যাচ্ছে কিনা জানা নেই—"

"এখনও আসেনি। তবে নকিং চলছে।"

"আপনি গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছেন না। সাধু! তাহলে ওই ডবল বছরের বৃদ্ধার সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলেন কেন?"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"ওর ঘরে যে জিনিসটা দেখেছি, তা তো ওই বয়েসে দরকার হয় না— এইডস এর ভয়ে দরকার হয়।"

সটান সামনে তাকিয়ে থেকে একটু শক্ত হয়ে গেলেন সুশোভনবাবু— "আমি নিরুপায়। এই একটা ইচ্ছে হাজার বছরেও যায় না। ওঁর যায়নি।"

"আপনাদের তো আমেরিকা থেকে ডাকছে। চলে গেলেই পারেন।"

"তাই তো যাব" বলেই, পাশ ফিরে স্মিতার চোখে চোখ রাখলেন সুশোভন— "আপনি সঙ্গে যাবেন?"

দুই চোখে একটু আবেশ ঘনিয়ে এনে স্মিতা বললে— "ভাবতে দিন।"

থানা এসে গেল এর পরেই।

ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্ত যখন থানায় ঢুকল, স্মিতা তখন গেছে অদ্রিকা বটব্যালকে আনতে।

ইন্টারভিউ রুমে চুপ করে বসেছিলেন সুশোভন তালুকদার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কনস্টেবল।

সে ঘরে না ঢুকে দারোগার ঘরে গেল জয়ন্ত। ইন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বললে— "নাম শুনেছেন নিশ্চয়। ইন্দ্রনাথ রুদ্র।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে থানাদার চপল চ্যাটার্জি বললেন— "বিলক্ষণ শুনেছি, তবে ইনি যে এত সুপুরুষ, তা জানতাম না। চোর-ছ্যাঁচোড় ধরতে ধরতে শরীর স্যার শুকিয়ে যায়, চোখ মুখ ক্রিমিন্যাল-ক্রিমিন্যাল হয়ে যায়—"

"কিন্তু আপনার হয়নি।"

কথাটা সত্যি। চপল চ্যাটার্জির চেহারা হিরোর মতো— ভিলেনের মতো নয়। দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, বলিষ্ঠ আকৃতি।

অমায়িক হাসলেন তিনি প্রশস্তি শুনে। বললেন— "কী হুকুম বলুন।"

"স্মিতা দাস গেছে মিসেস অধিকারীর বোন অদ্রিকা বটব্যালকে আনতে। উনি ফিরে এলেই ইন্টারভিউ রুমে পাঠিয়ে দেবেন।"

"ইয়েস, স্যার।"
"ততক্ষণ আপনার একজন অফিসার থাকবেন।"
এস আই দুর্জয় বাগ যাচ্ছেন।

দুর্জয় বাগ তাঁর বাঘের মতো চেহারা নিয়ে বসলেন একটু তফাতে। ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্ত বসল সুশোভনবাবুর মুখোমুখি— মাঝে কোনও টেবিল নেই।
রসকষহীন গলায় জয়ন্ত বললে— "সুশোভনবাবু, প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আপনি আন্ডার অ্যারেস্ট নন। আপনাকে থানায় আটকে রাখা হয়নি। আপনি যখন খুশি বাড়ি যেতে পারেন।"
"ধন্যবাদ," ইন্ডিয়ার বিল গেটস বুকের ওপর দু-হাত আড়াআড়ি ভাবে রাখলেন। যুদ্ধং দেহি পোজ।
"কিন্তু আইননিষ্ঠ নাগরিক আপনি। আমাদের সাহায্য করুন।"
"করব।"
"আপনার বয়স কত?"
"ছত্রিশ।"
"আপনি সফটওয়্যার প্রফেশন্যাল। চাকারি করেন?"
"চাকরিও করি, বাড়িতে বসেও প্রোগ্রামিং করি।"
"পয়সা পান?"
"নিশ্চয়।"
"মিসেস অধিকারীর সঙ্গে বখরাবখরি ছিল?"
একটু থেমে সুশোভন বললেন— "ছিল। ক্যাশ টাকায়।"
"কেন? ব্রেন আপনার, দরকার একটা কমপিউটার আর ইন্টারনেট কানেকশন। শেয়ার ওঁকে দিতেন কেন?"
"উনি ডিম্যান্ড করতেন। টেলিফোন, পেইং গেস্ট ইনকামিং ফোনের বেনিফিট পায়— ওঁর বাড়িতে। এক্সট্রা ফেসিলিটির জন্যে এক্সট্রা পেমেন্ট।"
"উনি কি ডিম্যান্ডিং টাইপের লেডি ছিলেন? ধরাবাঁধা নিয়মের কড়াকড়ি?"
"নট অ্যাট অল। উই ওয়্যার ফ্রেন্ডস।"
"অথচ দু-রাত বাড়ির বাইরে রইলেন, চিন্তা করলেন না?"
"এরকম আগেও করেছেন। ইচ্ছে হল তো রাত কাটিয়ে এলেন হোটেলে— অনেক রাত পর্যন্ত পার্টি করার পর।"
"ড্রিঙ্ক করতেন?"
"প্রচুর?"
"অধিকারী শব্দটার মানে, অধিকার বিশিষ্ট। ওঁকে সেইরকম মনে হয়েছিল?"
"হ্যাঁ, নিজের স্বত্ব সম্বন্ধে সজাগ।"
"পূর্বপুরুষ কি বেদান্তশাস্ত্র বেত্তা ছিলেন?"
"একেবারেই না। ছিলেন যাত্রা সম্প্রদায়ের কর্তা।"
"বারেন্দ্র না, বৈষ্ণব?"
"বারেন্দ্র। এই কলকাতার বারেন্দ্র মহলে প্রতাপ আছে। অত পার্টিতে যেতেন ওই কারণেই।"
"অনেক খবর রাখেন দেখছি। অথচ, দু-রাত তিনি বাড়ি না ফিরলেও আপনার উদ্বেগ হয় না।"
সুশোভনবাবু চুপ।
জয়ন্ত বললে— "এর আগেও এরকম করতেন। ফোন করে জানাতেন, বাড়ি ফিরব না?'
"না।"
স্মিতা সাহা ঢুকল ঘরে।

জয়ন্ত শুধু চাইল তার দিকে। প্রশ্ন রয়েছে চোখে।
স্মিতা বললে— "স্যার মিসেস অদ্রিকা বটব্যাল আইডেনটিফাই করেছেন মিসেস সুমনা অধিকারীকে।"
"ওঁর পুরো নাম?"
"হ্যাঁ।"
"বয়স কত বলেছেন?"
"ষাট।"
"আর কি বলেছেন?"
"দিদি ছিল কড়া। কিছুতেই মন উঠত না। টাকা অনেক। কিন্তু হাত উপুড় করত না। কাছে দু-পাঁচশ টাকা সব সময়ে থাকত।"
"হ্যান্ডব্যাগে কিন্তু টাকা ছিল না— খুচরো ছাড়া।" খুন কি তাহলে টাকার জন্যে?"
ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রাখল জয়ন্ত।
ইন্দ্র বললে— "উনি এখন বাড়ি গিয়ে রেস্ট নিতে পারেন। টেলিফোন নাম্বারটা রেখে যাবেন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার আগে থানায় জানিয়ে যাবেন।"
"বাট আই অ্যাম নট আন্ডার অ্যারেস্ট?" ঝট করে বললেন সুশোভনবাবু।
"বাট আন্ডার অবজারভেশন", ঝটিতি জবাব দিল ইন্দ্রনাথ।
"হোয়াট ফর?"
"কারণ আপনি সন্দেহভাজন। আপনার আচরণে আর কথায় অসঙ্গতি আছে। আপনি অবাক হননি যখন শুনেছিলেন, মিসেস অধিকারী আর বেঁচে নেই।"
বলেই চাইল স্মিতা সাহার দিকে— "কিছু বলার আছে?"
"বলব?" স্মিতার চোখ ঝকঝক করছে।
"নিশ্চয়।"
"উনি আমাকে প্রোপোজ করেছেন— এই সিচুয়েশনে। আর একটা খবর দিতে মুখে আটকাচ্ছে।"
"ইউ আর অন ডিউটি।"
"ওঁর সঙ্গে মিসেস সুমনা অধিকারীর সম্পর্ক ছিল। ঘরে তার প্রমাণ পেয়েছি। ইনি কবুল, করেছেন— আমার কাছে।"
"সুশোভনবাবু, আপনি এখন আসতে পারেন, কিন্তু বাড়িতে থাকবেন।" জয়ন্তর স্বর ইস্পাত-কঠিন।

নির্জলা তথ্য পাঠিয়েছেন প্যাথলজিস্ট। যা ঘটেছিল, তার বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন। এই প্রথম তদন্তে সহায়ক হিসেবে নিরেট বস্তু এল জয়ন্তর হাতে।
শ্রীমতী সুমনা অধিকারীর খুলি ফাটানো হয়েছে লম্বাটে গোলমত শক্ত কিছু দিয়ে। পর-পর তিনবার। খুব জোরে। মৃত্যুর সঠিক সময় নির্ধারণ করা কঠিন। ডেডবডি গাড়ির মধ্যে পড়েছিল খোলা জায়গায় অন্তত পক্ষে পুরো দুটো দিন। নির্ভুল সময় বলার পক্ষে তা অন্তরায়।
আঘাতের ধরন দেখে মনে হচ্ছে, প্রথম চোটেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে সিটের নিচে লুটিয়ে পড়েছিলেন। ওইখানে, ওই অবস্থাতেই, তাঁর মাথায় আবার চোট মারা হয়— পর-পর দু-বার। ফলে, তাঁর মৃত্যু হয়। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্যে।
রিপোর্ট পড়ল জয়ন্ত। পড়তে দিল ইন্দ্রনাথকে।
ডাক্তার সঞ্চিতা দাস যা বলে গেছেন, প্যাথলজিস্টের রিপোর্টের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। তিনি মৃতদেহ না ছুঁয়ে শুধু টর্চের আলোয় দেখে বলেছিলেন। এলেম আছে বটে। অথচ জেনারেল প্র্যাকটিশনার। প্যাথলজিস্ট নন।
ইন্দ্রনাথ রিপোর্ট নামিয়ে রাখল। "বলল— অনেকগুলো অনিশ্চয়তা এসে গেল।"
"যেমন?"
"মৃত্যুর সময়, শনিবারের রাত থেকে সোমবার সকাল। লম্বা মার্জিন। অনেক কিছুর সম্ভাবনা এসে যাচ্ছে।"
"মিসেস অধিকারী বোনের বাড়ি কখন গেছিলেন, সেখান থেকে কখন বেরিয়েছিলেন, এই দুটো সময় জানা গেলে, মার্জিন আরও কমে আসবে।"
"সে খবর দিতে পারবে স্মিতা সাহা। সে আসুক।"

স্মিতা বললে— "স্যার, মিসেস অধিকারী বোনের বাড়িতে যাননি। অন্য কোনও দিনও যাননি।"
নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ— "দুই বোনে সদ্ভাব ছিল না?"

"একদম না। মিসেস বটব্যালকে দেখেই তা বুঝেছিলাম— কথাবার্তা কেমন— কেমন। ডেডবডির কাছে নিয়ে গেলাম। আরও পরিষ্কার বুঝলাম। মড়া দেখে যদিও টলে পড়ে যাচ্ছিলেন— আমি ধরে না ফেললে পড়েই যেতেন। কিন্তু—"

"বলুন?"

"চোখে মুখে যেন স্বস্তি ফুটে উঠল, যেন আপদ গেছে।"

"দুই বোনের মুখে মিল আছে?"

"আছে আপনি দেখবেন?"

"থানায় আছেন নাকি?"

ডেডবডি দেখিয়ে থানায় এনেছি— যদি আপনারা কথা বলতে চান।"

"আপনার প্রিমনিশন আছে, মিস সাহা। সত্যিই কথা বলতে চাই শ্রীমতী অদ্রিকা বটব্যালের সঙ্গে। আর একটা জিনিস চাই।"

"বলুন।"

"মিসেস সুমনা অধিকারীর একটা ফটো। মড়া মুখের নয় কিন্তু।"

হেসে বললে স্মিতা— "তাও এনে দিয়েছেন সার্জেন্ট সাধুখাঁ।"

"যিনি ডেডবডি প্রথম দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। ডাক্তারকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কেসটার শেষ পর্যন্ত উনি দেখতে চান। তাই আমি যখন বললাম, মিসেস অধিকারীর জ্যান্ত মুখের একটা ফটো নিশ্চয় দরকার হবে আপনাদের— উনি গিয়ে এনে দিলেন।"

"কোত্থেকে?"

'কল্পনা-কানন' থেকে।

অদ্রিকা বটব্যাল এখন এদের সামনে বসে আছেন। তফাতে দাঁড়িয়ে স্মিতা। মুখে বিজয় গৌরব। গোয়েন্দানি কর্মজীবনে দুই বড় গোয়েন্দার সান্নিধ্যে থেকে কাজ করবার সুযোগ ক'জন পায়।

ছবিটার দিকে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্ত। সুমনা অধিকারীর ফটো। শক্ত চোখ। কড়া মুখ। কানে দুল অথবা নাকে অলঙ্কার নেই বটে, তবে চুলে শিল্পকর্ম আছে। বিউটি পার্লারের কারুকাজ।

"এ ছবি দেখেছেন সুশোভনবাবু?" জয়ন্তর প্রশ্ন।

"উনিই নিজের ক্যামেরায় তুলে দিয়েছেন," স্মিতার জবাব।

"বটে। কদ্দিন আগে?"

"তিন মাস আগে।"

"পেইং গেস্ট ভালই পেয়েছিলেন ল্যান্ড লেডি।"

বলেই, অদ্রিকার মুখপানে দৃষ্টি ঘোরাল জয়ন্ত। তিনি বসে আছেন জবুথবু হয়ে। শাড়ি পরা একটা বোঁচকা বললেই হয়। গায়ে গতরে ভারী। দিদির মতো স্লিম নন। চিবুকে গালে চর্বি। চোখ শুকনো। মুখভাবে দাপট বা কর্তৃত্ব বিন্দুমাত্র নেই। আদর্শ গিন্নি। কপালে টিপ। মাথায় সিঁদুর। অভাবী ঘরসংসার নিয়ে থাকলে মুখের মধ্যে যে অসহায়তা জেগে ওঠে, দম্ভ নিরুদ্দেশ হয়— এঁর মুখ সেইরকম। দিদির বিপরীত। তবে চৌকোনা চোয়াল, টিকোলো নাক, ঠেলে বের করা থুতনি প্রায় এক। সহোদরাই বটে। গায়ের রঙও দিদির মতন ফরসা। তবে প্রসাধনের খরচ বাঁচাতে গিয়ে একটু ময়লা হয়েছেন।

হাসি মুখে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তাকে দেখে আড়ষ্টতা কাটছে অদ্রিকার। জয়ন্তর গম্ভীর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না।

ইন্দ্রনাথ বললে— মিসেস অদ্রিকা বটব্যাল, আপনার নামটি সুন্দর।

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে। এই প্রথম হাসলেন অদ্রিকা। গালে টোল পড়ল। কে জানে, বেঁচে থাকা অবস্থায় সুমনা অধিকারী হাসলে গালে পড়ত কিনা। বললেন— "কিন্তু নামের মানেটা বাজে। সবাই খেপায়।"

"সবাইয়ের মধ্যে আপনার কর্তা আছেন?"

"আছেই তো, বলে কিনা, পূর্বজন্মে আমি নির্ঘাৎ অপ্সরা ছিলাম। ব্রহ্মপাপে যমুনার জলে বাস করতাম। তারপর ইয়ে হয়েছিল।"

"সত্যবতীর মা হয়ে গেলেন।"

অদ্রিকার মুখ একটু রক্তিম হল।

"অদ্রিকা কিন্তু বেদব্যাসের দিদিমা", বলে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ।

"ওইটাই যা ভাল কথা।"

কাজের কথায় চলে এল ইন্দ্রনাথ— "আপনার দিদি ছিলেন আপনার উলটো ধাতের?"

ঠোঁট বেঁকে গেল অদ্রিকার— "টাকা থাকলে যা হয়।"

"কড়া? দাম্ভিক? নাক উঁচু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"টাকা পয়সা অঢেল?"

"জামাইবাবু রেখে গেছিলেন। ইনসিওরেন্সের টাকা ব্যাঙ্কে টাকা, কোম্পানির শেয়ার, তিন খানা বাড়ি।"

"ব্যবসা বাণিজ্য?"

"যাত্রা কোম্পানি বেচে দিয়েছিলেন।"

"আপনার দিদি কি নামতেন যাত্রায়?"

"যাত্রা করতে করতেই তো জামাইবাবুকে বিয়ে করেছিল।"

"ছেলেপুলে?"

'হয়নি'।

"হাত দরাজ ছিল?"

"ঠিক উলটো, রামকিপটে।"

"কী করে জানলেন?"

"হাড়ে হাড়ে জেনেছি। আমার কর্তা ছিল নার্সিং হোমে— ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। অজ্ঞান, তিনদিন। বিশ হাজার টাকার দরকার। চেয়েছিলাম। দিয়েছিল দিদি। কিন্তু শর্ত ছিল, সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে।"

"সুদ সমেত!"

"হ্যাঁ, সুদ সমেত। মাসে মাসে। হাজার টাকা আসল, সেই সঙ্গে বাকি টাকার সুদ। কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হয়েছে প্রতি মাসে। কসাই?"

"বাড়ি গিয়ে টাকা নিতেন?"

"চেক পাঠিয়ে দিতাম। বাড়ি যেত না। কতবার বলেছি, টাকার দম্ভ। মাটিতে পা পড়ে না। কিপটে। নতুন গাড়ি কেনে না।"

অদ্রিকার চোখে মুখে শোকের ছায়া নেই।

কীরকম দিদি ছিলেন সুমনা অধিকারী?

'কল্পনা-কানন'এর সামনে এসে দাঁড়াল পুলিসের গাড়ি। আগে নামল জয়ন্ত আর ইন্দ্রনাথ, তারপর, স্মিতা আর অদ্রিকা।

স্নিগ্ধ স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ— "যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন তো দিদির এই বাড়ি, অন্য বাড়ি, সমস্ত টাকা পয়সা আপনার, ওঁর একমাত্র আত্মীয় বলতে তো আপনিই।"

অদ্রিকা প্রসন্ন হলেন। জবাব দিলেন না।

ফটক পেরিয়ে বাগানের পথে হাঁটবার সময়ে কিন্তু চোখ নামিয়ে রইলেন অদ্রিকা, দু-পাশের প্রস্তর-রমণীদের দিকে তাকাতে পারছেন না। অভিনেত্রীর বোন বলে মনেই হয় না।

মস্ত দরজা বন্ধ। সামনে দাঁড়িয়ে কনস্টেবল। হাতে নাইট-ল্যাচের চাবি।

দেখেই টনক নড়েছিল জয়ন্তর। বলেছিল রুক্ষ গলায়— "সুশোভনবাবু বেরিয়েছেন নাকি?"

"আজ্ঞে। আমাকে চাবি দিয়ে গেলেন। বললেন, এখুনি ফিরবেন।"

"কোথায় গেছেন বলে গেছেন?"

"বাজারে।"

"ঠিক আছে, দরজা খোলো।"

রান্নাঘরে ঢুকে অবাক হলেন অদ্রিকা— সবই তো দেখছি নতুন।

"মানে?" জয়ন্তর প্রশ্ন।

"পুরোনো জিনিস যকের ধনের মতো আগলে রাখত। গাড়ি পালটাব না, গ্যাসের পুরনো উনুন পালটাব না।— এ তো দেখছি নতুন উনুন। ইস্, ঝকঝক করছে। এটা কী?"

"মাইক্রোওভেন। সেকেন্ডে সেকেন্ডে রান্না করার জন্যে।"

"জীবনে দেখিনি। নিশ্চয় অনেক দাম। এটা?"

"ওয়াশিং মেশিন।"

"একদম নতুন। খুব টাকা ওড়াচ্ছিল তো! আর আমার গলায় গামছা দিয়ে সুদ আদায় করছিল।"

“এতই যদি টাকা, তাহলে বাড়িতে পেইং গেস্ট রেখেছিলেন কেন?”

আলগোছে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল ইন্দ্রনাথ অদ্রিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে— ষড়যন্ত্রী স্বরে।

মুখ লাল হয়ে গেল অদ্রিকার— “আমি জানি না।”

“জানেন, কিন্তু বলতে পারছেন না।”

“বলা যায় না।”

“কিন্তু ধরিয়ে দেওয়া তো যায়। ষাট বছরেও ইচ্ছে যায়নি। যযাতি। স্ত্রী-লিঙ্গের।” আর একটু রাঙা হলেন অদ্রিকা— “আগে তাড়াব ওকে।”

কিন্তু ঘটল তার বিপরীত।

সদর দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হল। পাল্লা খুলে গিয়েই বন্ধ হলো বাড়ি কাঁপানো শব্দে। করিডর বেয়ে এগিয়ে এল বুট জুতোর শব্দ।

রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সুশোভন তালুকদার। হাতে মার্কেটিং বাস্কেট— প্লাস্টিকের। চোখ মুখ পাথর।

তিনি চেয়ে আছেন অদ্রিকার দিকে।

অদ্রিকার মুখ থেকে যেন রক্ত নেমে গেছে। পেইং গেস্টকে এত ভয়?

সুশোভনবাবুর চোখ ঘুরে গেল এবার স্মিতার দিকে। এ চোখ এখন প্রসন্ন নয়। কঠিন।

বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে— "ফের কী মতলবে?"

চাবুক জবাব দিল স্মিতা— "আপনার মতলব ধরবার জন্যে।"

উত্তর না দিয়ে অদ্রিকার দিকে চাইলেন সুশোভন তালুকদার। গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্তকে।

বললেন অদ্রিকাকে— "আপনি কে?"

রীতিমতো থতমত খেয়ে গেলেন অদ্রিকা বটব্যাল। "বটব্যাল" উপাধি এঁকে মানায় না!

বললেন আমতা আমতা করে— "বোন... সুমনা অধিকারীর বোন।"

ভাবখানা, যেন কতই না অপরাধ করে ফেলেছেন দিদির বাড়ি এসে।

হাতের বোঝা রান্নাঘরের ভেতরে মেঝেতে রাখলেন সুশোভন তালুকদার। দু'হাত ছড়িয়ে রান্নার জিনিসপত্র দেখিয়ে বললেন দরাজ গলায়— "যা খুশি নিয়ে যেতে পারেন। শাড়ি, ব্লাউজও। গয়না বাদে।"

জয়ন্তর প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল টেনে চড় কষানোর। পুলিস তো— হাত আগে চলে— কথা পরে।

কিন্তু চিনির রসে কথা ডুবিয়ে বলে গেল ইন্দ্রনাথ— "মহাশয়ের কি অধিকার আছে জিনিস বিলোনোর?"

"আছে।" এ সবই আমার, আমাকে দিয়ে গেছেন।"

"আপনাকে দিয়ে গেছেন?" চিনির রস একটু একটু করে বিছুটির রস হয়ে যাচ্ছে।

"আজ্ঞে। এই বাড়ি, বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র। আরও দুটো বাড়ি, গাড়িটাও।"

"আমি জানতাম, আমি জানতাম, ককিয়ে উঠলেন অদ্রিকা— কিছুই পাব না আমি।"

"কাছে থাকলে পেতেন," কেটে কেটে বললেন সুশোভন তালুকদার।

"সহোদরার চাইতে কাছের জন আর কেউ কি হয়?" ইন্দ্রনাথের চোখে হীরের ঝলসানি শুরু হয়েছে।

"হয় বইকি", সুশোভনের কণ্ঠে ব্যঙ্গের ভোজালি।

"কি ভাবে?"

"সুমনা আমার স্ত্রী। বিয়ে হয়েছে এক মাস আগে। ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখতে চান?"

স্মিতা আর অদ্রিকার চোখে যখন অবিশ্বাসের ছানাবড়া, ইন্দ্রনাথ তখন মধুক্ষরা কণ্ঠে বলছে অদ্রিকাকে— "এই রান্নাঘরে এর আগে আপনি এসেছিলেন?"

গলা দিয়ে কোনও মতে কথা বের করে অদ্রিকা বললেন— "এসেছিলাম।"

"এই সব নতুন নতুন জিনিসপত্র আসবার আগে?"

"হ্যাঁ।"

"ঘরে কটা শিলাপট্ট ছিল?"

"কি ছিল?"

"শিলাপট্ট... শিলাপট্ট বাটনা বাটার শিল আর নোড়া। একটা, না, দুটো?..."

"দুটো।"

নিমেষে ইন্দ্রনাথের চোখ ঘুরে গেল সুশোভন তালুকদারের দিকে— "আর একটা শিলাপট্ট কোথায় গেল?"

একেই বলে কশাঘাত। কথার চাবুক, সুশোভন তালুকদারের পাথর মুখও কেঁপে গেল। কিন্তু জবাব দিলেন না।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু থামবার পাত্র নয়— "দুটো শিল, আর দুটো নোড়া ছিল।— নিশ্চয় একটা ছোট, আর একটা বড়?" শেষের প্রশ্নটা অদ্রিকাকে।

অদ্রিকা বোবা। এঁর চোখের রোগ আছে। ব্রেন তোলপাড় হলে একটা চোখের মণি সরে যায়। এখন তাই হয়েছে।

এই প্রথম ধমকাতে দেখা গেল ইন্দ্রনাথকে— "বলুন? জবাব দিন? একটা শিল-নোড়া ছোট, আর একটা শিল-নোড়া বড়?"

গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারলেন না অদ্রিকা— ঘাড় কাত করে যা বলতে চাইলেন, তার মানে— হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের চোখ ঘুরে গেল স্মিতার দিকে— "আপনি গিয়েছিলেন প্যাথলজিস্টের কাছে?"

"আজ্ঞে।" ঢোক গিলছে স্মিতা। স্বভাবে সে রণচণ্ডী, কিন্তু এহেন রণমূর্তি পুরুষ অপিচ দেখেনি।

"সেখানে রক্তমাখা নোড়া দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলাম।"

"এখানে যে নোড়াটা দেখছেন, এর চাইতে বড়, না ছোট?"

"ছোট।"

মুহূর্তে সুশোভনকে হীরক-নয়নে প্রায় ঝলসে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ— "মহাশয় সুশোভন তালুকদার, ছোট শিল-টা কোথায় লুকিয়েছেন?"

জবান নেই। শ্রোতা এখন ছাইবর্ণ।

বক্তা নিষ্করুণ— "পুলিসের একটা কুকুর আছে। তার নাম র‍্যাডার। ছোট নোড়া-টা ঝোপের মধ্যে থেকে শুঁকে শুঁকে সে উদ্ধার করেছে। ছোট শিলটাও শুঁকে শুঁকে বের করবে— হয়তো এই বিশাল বাগানেই। তাই না সুশোভনবাবু?"

পেশি কাঁপছে সুশোভনবাবুর বদন মণ্ডলের।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু এখন নিঠুর, নির্মম, নির্দয়— "দু-রাত আপনার স্ত্রী বাড়ি ফেরেননি। আপনি খোঁজ নেননি। কেন?"

জবাব দিন।

"দু'দিন দু'রাত্রি বাড়ি থেকে বেরননি? বাজার করতে যাননি? আজকের মতো? ঘরে তো ফ্রিজ নেই— রোজ যেতে হয় বাজারে। যাননি?" জবাব নেই।

"এই বাড়ি থেকে একটু দূরেই দু'দিন দু'রাত ধরে পড়েছিল অস্টিন ইলেভেন হান্ড্রেড— যে গাড়ি নাকি এখন আপনার। গাড়িটার জন্যেও প্রাণ কাঁদেনি? কেঁদেছিল... কেঁদেছিল... কিন্তু গাড়ি ফিরিয়ে আনতে গেলে যে মরা বউকেও ফিরিয়ে আনতে হয়... তাই দেখেও দেখেননি। ব্র্যাভো, সুশোভন তালুকদার!"

পরক্ষণেই সুধাময় হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর— স্বরে বাজছে না আর দুন্দুভি, চোখে নেই বজ্র-অনল। চেয়ে আছে অদ্রিকার পানে— "ম্যাডাম, একটু কষ্ট করতে হবে আপনাকে। ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে। নোড়া-টা দেখে বলবেন, সেই নোড়া এই রান্নাঘরে ছিল কিনা। থাকলে, কোনখানে ছিল। ওইখানে? বেশ, বেশ।"

এবার টার্গেট স্মিতা— "আপনি এঁকে সসম্মানে নিয়ে যাবেন। তার আগে সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ-কে খবর দিন— যেন চলে যান ল্যাবরেটরিতে— তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন খুনে নোড়া, তারপর, একটা স্টেটমেন্টে সই করিয়ে নেবেন ম্যাডাম অদ্রিকা বটব্যালকে দিয়ে— উইটনেস সিগনেচার করবেন আপনারা দু-জন।

দিস ইজ অ্যান অর্ডার ফ্রম মিস্টার জয়ন্ত চৌধুরী। ও-কে, জয়ন্ত?"

"দ্যাটস রাইট", বললে জয়ন্ত।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু থামল না— "মিস স্মিতা সাহা, আপনার ওপর আর একটা দায়িত্ব দিতে চাই। অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব।

"হুকুম করুন।"

"আমি করছি না। জয়ন্ত, র‍্যাডারকে এখানে দরকার। প্যাথলজিস্ট যাতে নোড়া-টা দেন মিস সাহা-র হাতে, সেই ব্যবস্থা করে দে। র‍্যাডারকে নিয়ে আসবেন সার্জেন্ট সাধুখাঁ। নোড়া কোথায় ছিল এই রান্নাঘরে— র‍্যাডার দেখিয়ে দেবে। প্লিজ অ্যারেঞ্জ।"

"আর, কিছু?" স্মিতার সবিনয় প্রশ্ন।

"বাইরে চলুন বলছি।"

স্মিতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পাংশুবদন সুশোভন তালুকদারকে দেখিয়ে ছাড়ল শেষ শক্তিশেল— "এঁর এখন থানায় থাকা দরকার। এইবার হবে জেরা।"

ঘটনাপ্রবাহ যখন বেগবান হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে সার্জেন্ট সাধুখাঁ আয়েশ করে বসেছিলেন ডাক্তার সঞ্চিতা দাসের চেম্বারে। তাঁর নাকি গা-গতরে ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করছে— জ্বর-টর কি আসছে?

উজ্জ্বল নয়নে সাধুখাঁ-র কাফ্রি-বপু দেখতে দেখতে হেসে ফেলেছিলেন ডাক্তার।

বলেছিলেন— "নাড়ি দেখার দরকার নেই। যে কোনও নারী এই জ্বর ধরতে পারে— যারা ধরা দেয়। তখন জ্বর সেরে যায়।"

এইসব ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি সার্জেন্ট চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন— "আপনি কথা দিচ্ছেন, আমার জ্বর সেরে যাবে?"

"যাবে, যাবে, যাবে!"

সংক্ষিপ্ততম কোর্টশিপ। কিন্তু ঘটনা যা, তা তো বলতে হবে! এটা ফাস্ট-ফুড'এর যুগ। সময়ের অপচয় কোনও ক্ষেত্রেই নয়। জয়ন্ত চৌধুরির তলব এল তারপরেই। শুরু হল জেরার শলাকা দিয়ে রহস্য-গ্রন্থি আলগা করার রুদ্ধশ্বাস নাটক।

থানার ইন্টারভিউ রুমে এখন সুশোভন তালুকদারকে ঠিক মাঝখানে বসানো হয়েছে। ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্ত বসেছে তাঁর সামনে। পেছনে দাঁড়িয়ে শার্দুল-আকৃতি সাব-ইন্সপেক্টর দুর্জয় বাগ।

ইন্দ্রনাথের চোখে ভাবুকের দৃষ্টি। মনের মধ্যে কিন্তু যুক্তির অস্ত্রে শান দিয়ে নিয়েছে। আক্রমণের নীতি নেওয়ার আগে আট-ঘাট বেঁধেই সব প্রমাণের উদ্যত সুচিমুখ কেন্দ্রিত করেছে শেষ মুহূর্তের দিকে, পুতুল-নাচের সুতো তার হাতে।

কিন্তু সঙ্কোচের শৈত্য নেই সুশোভন তালুকদারের চোখে মুখে। সাপ আর নেউল দুজনেই রয়েছে মেজাজে। যদিও তাঁর কুৎসিত নগ্ন রূপ এখন প্রকট।

শুরু করল ইন্দ্রনাথ— "সুশোভনবাবু, ভৃগুর গণনা বিশ্বাস করেন?"

"না", স্বরযন্ত্র যেন লোহা দিয়ে নির্মিত।

"জীবনের মামলায় রায় ঠিক হয়ে থাকে আগে থেকেই— চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানায়।"

জবাব দিলেন না সুশোভন তালুকদার। গলার মধ্যে লোহায় লোহা ঠুকলেন না।

ইন্দ্রনাথ শানানো গলায় বলে গেল— "আপনার পঙ্কিল পিছল পথের অনেক জানা গেল। একটু ঝালাই করে নেওয়া যাক। আপনার স্ত্রী-কে আপনি শেষ দেখেছিলেন দুপুর দেড়টার সময়ে মদ্যশালার সামনে। উনি আপনাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বোনের কাছে নাকি গেছিলেন। কিন্তু বোন বলছেন, উনি যাননি।"

"আমাকে বলেছিলেন, যাবেন।"

"কোন মদ্যশালার সামনে আপনাকে নামিয়ে দিয়েছিলেন?"

এবার আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না সুশোভন তালুকদার।

তারপর বললেন— "নামটা মনে পড়ছে না।"

"প্রায়ই যেতেন নিশ্চয়ই সেখানে? মদ্যপানের অভ্যেস যখন আছে।"

"নেই।"

চমৎকার! তাই মধুশালার নামটাও মনে নেই! জায়গাটা কোথায়? আবার ভাবছেন সুশোভনবাবু।

ইন্দ্রনাথের চোখের ভাবুক দৃষ্টি কেটে যাচ্ছে— "তাও মনে পড়ছে না? তাহলে এক কাজ করা যাক। পুলিস অফিসারের সঙ্গে যান। দোকানটা দেখলেই মনে পড়বে। উঠুন।"

ওর কণ্ঠস্বর এখন জলদগম্ভীর। ছেড়েছে রঙের তাস। তুরুপের তাস।

জয়ন্ত তদন্তের গতিপথ ধরে ফেলেছে। অদ্ভুতভাবে প্রমাণ সাজাচ্ছে ইন্দ্রনাথ, যোগাড় করছে সাক্ষীসাবুদ। দৃঢ় লাগাম ধরে বিজয়-রথকে নিয়ে চলেছে চক্রব্যূহের কেন্দ্রের দিকে। রথের অক্ষের সঙ্গে লাগানো রয়েছে ক্ষুরধার উপস্থিত বুদ্ধির ফলক।

সাব-ইন্সপেক্টর দুর্জয় বাগের দিকে তাকিয়ে বললে— "বুঝেছেন?"

দুর্জয় বাগ অ্যাটেনশন পোজ নিয়ে বললেন—"ইয়েস, স্যার।"

"ওঁকে নিয়ে বার-এর ভেতর যাবেন। ক্রিস্টমাস ইভের দিন দুপুর দেড়টার সময়ে ড্রিঙ্ক করতে গিয়েছিলেন কিনা, তা জিজ্ঞেস করবেন। কাদের জিজ্ঞেস করবেন?"

"যারা ড্রিঙ্ক সার্ভ করে, টিপস নেয়।"

"কারেক্ট। যান।"

কড়া ওষুধ নির্বিকার মুখে গিলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুশোভন তালুকদার।

জয়ন্ত বললে— "ভাল... ভাল... তদন্তের রায় আগেই ঠিক হয়ে গেছে, এখন চলছে মামলা সাজানোর কাজ।"

আর, ভাঙার কাজ, ইন্দ্রনাথের মন্তব্য— "কঠিন ঠাঁই। নৈতিক চরিত্র যারা জলাঞ্জলি দেয়, তারা এইরকম ঢেঁটা হয়। এদের ভাঙতে হলে চাই রসদ। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর। স্মিতা সাহাকে লেলিয়ে দিয়েছিলাম এই জন্যেই।"

বলতে না বলতেই ঘরে ঢুকল স্মিতা সাহা। পিছনে কাফ্রি-অবয়বী সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ।

দুজনের মুখই ঝলমল করছে।

চকিতে দুজনের মুখ নিরীক্ষণ করে নিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে— "ব্যাপার কী? স্মিতা সাহার মুখে কৌতুক, বিজয় সাধুখাঁ-র মুখে লজ্জা-লজ্জা ভাব। কেন? আরে, আমি দাদা হই, বলতে বাধা কী? তেতো বিষের এই তদন্তে মধুর উত্তেজনা কিছু ঘটেছে নাকি?"

"স্যার, আপনার অন্তর্দৃষ্টি আছে," বললে স্মিতা।

শুধরে দিল জয়ন্ত— "ওকে আমরা, মানে, বন্ধুরা বলি— ভুশণ্ডি। ত্রিকালজ্ঞ কাক।— কিন্তু ব্যাপারটা কী? পুলিসে-পুলিসে মালাবদলের ব্যাপার ঘটতে চলেছে নাকি?.."

"তাহলে তো লাঠালাঠি লেগে যাবে। তবে হ্যাঁ, মালাবদল একটা ঘটতে চলেছে পুলিসে-ডাক্তারে।"

তরল কণ্ঠে ইন্দ্রনাথ বললে— "এবং সেই ডাক্তারটি নিশ্চয় সঞ্চিতা দাস?"

চোখ কপালে তুলে স্মিতা বললে— "আপনি জানলেন কী করে?"

ভুশণ্ডির কাক বলে।— "সঞ্চিতা আমাকে শ্রদ্ধা করে। সার্জেন্টের কাছে শুনেছে, আমি এই কেসে রয়েছি। মোবাইলে একটু আগে ফোন করে বলেছিল— 'ফাঁদে পা দেওয়ার আগে জেনে নিতে চাই সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ লোকটা কীরকম?' আমি বললাম— 'লোকটা কালো, কিন্তু ভেতরে আলো।'— যাক, কাজ কদ্দূর?"

স্মিতা একটা খাম আর একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললে— "এই নিন স্টেটমেন্ট। খামের ভেতরে কী আছে, আমি দেখাতে পারব না। দেখে নেবেন।—

মিসেস অদ্রিকা বটব্যাল নোড়া চিনতে পেরেছেন। রান্নাঘরে ছিল। একটা দিক ভাঙা। মাঝখানে খোবল, তাই কাজে লাগত না।" খামের ভেতরকার বস্তুটা দেখে নিয়ে জয়ন্তর হাতে তুলে দিল ইন্দ্রনাথ। বললে— "গুড। অ্যান্ড ইউ? সার্জেন্ট বিজয় সাধুখাঁ? র‍্যাডার জায়গাটা চিনিয়ে দিয়েছে?"

অনাবশ্যক স্যালুট মেরে বললেন সার্জেন্ট— "স্যার র‍্যাডারকে পুলিস মেডেল দেওয়া উচিত। রান্নাঘরে ঢুকেই দেখিয়ে দিয়েছে কোথায় ছিল নুড়ি। নুড়ি ছিল আমার হাতে। গন্ধ শুকেই দৌড়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল। দাগ রয়েছে শিল আর নোড়ার। অনেকদিন শিল খাড়া করে রাখলে দাগ তো পড়বেই। নাক বটে একখানা।"

"সেই নাক কি শিল খুঁজে বের করেছে?"

"করেছে, আঁস্তাকুড়ের নীচের দিকে ছিল।"

"গুড।"

কথা শেষ হল, ঘরে ঢুকলেন দুই মূর্তি।

মহাত্মা সুশোভন তালুকদার আর সাব-ইন্সপেক্টর দুর্জয় বাগ।

রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত— "স্যার, মধুশালার নাম প্যারাডাইস। ক্রিস্টমাস ইভের দিন ইনি— "মহাত্মাকে দেখিয়ে—" ওখানে যাননি। তবে মাঝে মাঝে যান। চেনা মুখ। হুইস্কি ছাড়া কিছু খান না।"

ইন্দ্রনাথ বললে— সুশোভনবাবু, গয়বী খেলা কাকে বলে জানেন? জানেন না। ছক না দেখেই দাবা খেলা। যেমন এখুনি হল। এখানে বসে থেকেই ঘুঁটি চালা হল আপনার ছকে।"

সুশোভনবাবু টসকালেন না। আবার সেই সাপ আর নেউল। একই

মেজাজে।
কণ্ঠস্বরে দূরায়ত বজ্র-নির্ঘোষ এনে ইন্দ্রনাথ বললে— "মিথ্যার পর মিথ্যা বলে চলেছেন। ধরা পড়ে যাচ্ছেন। মিথ্যা টেকে না, সুশোভনবাবু। শনিবার বিকেলে কোথায় ছিলেন?"
"বাড়িতে", সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণ উচ্চারণে বললেন সুশোভনবাবু।
"কী করছিলেন?"
"টি-ভি দেখছিলাম।"
"কী প্রোগ্রাম হচ্ছিল তখন?"
থমকে গেলেন সুশোভনবাবু। মনে করবার চেষ্টা করছেন। ইন্দ্রনাথ বলে যাচ্ছে— "মনে পড়ছে না? কেবল টিভি আছে তো?"
"আছে।"
"কোন চ্যানেলে দেখছিলেন? তাও মনে পড়ছে না? ডাহা মিথ্যে আর কত বলবেন? আপনার স্ত্রী তখন কোথায় ছিলেন?"
"হোটেলে।"
"একা?"
"প্রায় যেতেন। বদভ্যেস। এক রাত, দু-রাত, তিন রাত কাটিয়ে আসতেন।"
"অকারণে? না, কারণে?"
"বলতেন না।"
"কোন হোটেলে?"
"বলেননি।"
"তাই আপনি দু-রাত স্ত্রী-বিহনে একা ছিলেন? খোঁজ নেননি?"
"হ্যাঁ"
"অস্টিন ইলেভেন হান্ড্রেড গাড়িখানা এ অঞ্চলে অনেকদিন যাতায়াত করছে। চেনে অনেকেই। কিন্তু দেখেনি কেউ।"
মিথ্যে বলল ইন্দ্র। যাচাই করলে সেটা সত্যিই হবে, কিন্তু সে সময় দিল না। অন্তর্ভেদী চোখে চেয়ে রইল সুশোভনবাবুর মুখের দিকে।
তিনি ভাঙছেন। চোখের তারায় তার লক্ষণ। মিথ্যের পিছল পথে হড়কে যাচ্ছেন।
ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ল ইন্দ্রনাথ— "আপনি মদ্যপান করতে যাননি?"
"না।"
নৈঃশব্দ্য।
"মিথ্যে বললেন কেন?"
"প্রায়ই বলি।"
"কেন বলেন?"
"না বলে থাকতে পারি না।"
"আপনার স্ত্রী হোটেলে থাকতে গেলেন কেন? আপনি স্বামী। নিশ্চয় জানেন।"
"জানি।"
আবার নীরবতা।
তারপর কণ্ঠস্বরে টঙ্কার জাগ্রত করল ইন্দ্রনাথ— "কেন?"
"ঝগড়া হয়েছিল বলে।"
"আপনার সঙ্গে?"
"হ্যাঁ।"
"কখন?"
"খেতে বসে।"
"কি নিয়ে?"
"টাকা নিয়ে।"
বলেই, পকেট থেকে চেক বই আর পাসবুক বের করলেন সুশোভনবাবু। দিলেন ইন্দ্রনাথের হাতে। ইন্দ্রনাথ দিল জয়ন্তকে।
দেখে নিয়ে জয়ন্ত বললে— "স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট। চেকে দুজনের নাম ছাপা। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করেছিলেন দেখছি। আঠারো লাখ টাকা তোলা হয়েছে। কে তুলেছিলেন?..."
"আমি।"
"কেন?"
"একটা সফটওয়্যার কেনবার জন্যে।"
"আঠারো লাখ দাম?"
"অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ডিম্যান্ড আছে। অর্ডার পেয়েছিলাম, টাকা ছিল না। এই টাকা তোলা নিয়েই ঝগড়া।..."
লিখিত অর্ডার?
"না।"
'মৌখিক অর্ডার?"
"হ্যাঁ।"
"কোন কোম্পানি?"
সুশোভন নিশ্চুপ।
হিসহিসিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ— "ফের মিথ্যে। এ টাকা সফটওয়্যারের জন্যে তোলেননি। অন্য উদ্দেশ্য ছিল।" সুশোভনবাবু বোবা।
জয়ন্ত চাইল ইন্দ্রনাথের দিকে। মার্ডারের মোটিভ পাওয়া গেছে। ইন্দ্রনাথ ঝুঁকে পড়ে অগ্নিবর্ষী চোখে রূঢ় স্বরে টানল যবনিকা—
"স্ত্রী-কে খুন করলেন কেন?"
"এত খিটিমিটি সহ্য হচ্ছিল না।"
এক গ্রাম চড়ল ইন্দ্র-র কণ্ঠস্বর— "কখন খুন করলেন?"
"শনিবার রাতে।"
"বাড়ি ফিরে আসার পর?"
"একসঙ্গেই বেরিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে।"
"সত্যি বলছেন?"
"হ্যাঁ। এবার সত্যি বলছি।"
দুপুরে খাওয়ার পর থেকে রাত পর্যন্ত গাড়ি টো-টো করলেন?"
"হ্যাঁ।"
"মিথ্যে কথা। এখনও সত্যি ঢাকছেন। আপনি স্বেচ্ছায় খুন করেননি। আপনি যন্ত্র। যন্ত্রী কে? ষাট বছরের স্ত্রী আপনার আগে মারা যেতেন। আপনিই সব পেতেন। আঠারো লাখ কিসসু না। কুঁচবরণ কন্যে মেঘবরণ চুল ছিল আপনার মুঠোয়। সোনার ডিম পাওয়ার জন্যে সোনার হাঁস মারার মতো নির্বোধ আপনি নন। লোহার জাল ছেঁড়া যায়, মিথ্যের মাকড়সার জাল ছিঁড়তে গেলে আরও শরীরে জড়িয়ে ধরে। বলুন, কেন খুন করা হল।"
সুশোভন নিশ্চুপ।
জয়ন্তের দিকে চোখ ফেরাল ইন্দ্রনাথ— "ফুল ট্রিটমেন্ট!"
জয়ন্ত চাইল দুর্জয় বাগের দিকে।
দুর্জয় বাগ বাঘের থাবা রাখলেন সুশোভনবাবুর চেয়ারের পেছনে।
চমকে উঠলেন সুশোভন তালুকদার— "একী!" গলায় প্যানিক। অ্যাড্রেনালিন ক্ষরণ বেড়ে গেছে।
"সত্যি বলুন", ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ— "কাউকে আড়াল করছেন। কাকে?"
বিবর্ণ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তার পরেই রুদ্ধ কান্নার ঢেউ উথলে উঠল। ফুঁপিয়ে উঠলেন। দু-হাতে মুখ চাপা দিলেন।
হাত নামানোর সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাল রাগের চরমে চলে গেল ইন্দ্রনাথ— "কাকে আড়াল করছেন, সুশোভনবাবু? খুন আপনিই করেছেন। শুধু টাকার জন্যে? না, না, না। আপনার স্ত্রী প্রায়ই অন্যত্র রাত কাটিয়ে আসতেন! কলঙ্কের গন্ধ পাচ্ছি! কোথায় যেতেন? বলুন... বলুন...?
ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেন সুশোভন তালুকদার— রজত দীক্ষিতের কাছে।"
"কে তিনি?"
"সুমনার বয় ফ্রেন্ড।"
"বয়স কত তাঁর?"
'চৌষট্টি।"
"ঈর্ষার ছোঁয়াচ লেগেছিল আপনার মনে?"
"না..না.. ঠিক উলটো রজতবাবু সহ্য করতে পারছিলেন না আমাকে... সুমনাও আর সহ্য করতে পারছিল না ওঁকে... আমাকে বলেছিল পারবে? পারবে? পারবে ওকে শেষ করে দিতে? তারপর আমরা তিনখানা বাড়ি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিয়ে পালাবো আমেরিকায়। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। পারব। নোড়া নিয়ে বেরিয়েছিলাম। পাইকপাড়ায় গিয়ে রজতের মাথা

গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম গাড়িতে। বাড়ির কাছে এসে সুমনাকে শেষ করেছিলাম। পাশপোর্ট ইত্যাদি রেডি, প্রোমোটার রেডি— শনিবারের মধ্যেই চলে যেতাম আমেরিকায়।”

কচ্ছপের মরণ-কামড়ও নাকি মেঘের ডাকে আলগা হয়ে যায়। মিথ্যেকে কামড়ে ধরেও ধরে রাখতে পারলেন না জোড়া খুনের খুনী।

বললেন স্খলিত স্বরে— “আঁচ করলেন কী করে?”

“আপনার স্ত্রী-র ঘর তল্লাশির কথা যখন বলেছিলাম, আপনি চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, ‘ওঁর জিনিসপত্র হাঁটকাবেন নাকি?”— মনে পড়ছে, কেন চমকে উঠেছিলেন? রজতের রেফারেন্স যদি বেরিয়ে যায়— এই ভয়ে। ঠিক বলছি?”

“হ্যাঁ।”

“আমার খটকা লেগেছিল। তাই গোয়েন্দানি স্মিতা সাহাকে গোপনে একটা ভার দিয়েছিলাম। জানে শুধু আমার এই বন্ধু-জয়ন্ত চৌধুরী। স্মিতা আঁতিপাতি করে খুঁজে আপনার স্ত্রীর খাটের গদির তলায় গোঁজা একটা ছবি পেয়েছিল। জয়ন্ত, এবার দেখা সেই ছবি।”

শার্টের পকেট থেকে একটা হাফ-সাইজ এনলার্জমেন্ট বের করল জয়ন্ত।

ছবিটা কদর্য।

নারী আর পুরুষের শরীরের ওপর দিয়ে কালো কালিতে লেখা— ‘আমার সুমনা... রজত দীক্ষিত।’

থামল ইন্দ্রনাথ। অনেকক্ষণ পরে।

বললে— “পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না। রজত দীক্ষিতের ঠিকানা টেলিফোনের গাইড বুকে পেয়ে গেছি। সেখানে পুলিস চলে গেছে। এই ছবির নেগেটিভ নিতেই আপনি গেছিলেন— আঠারো লাখের বিনিময়ে। ঠিক বলছি তো? গুড। এক হাতে নেগেটিভ নিয়েছেন, আর এক হাতে নোড়া চালিয়েছেন। ঠিক বলছি? গুড। তারপর, আঠারো লাখ তুলে নিয়ে চলে এসেছেন, কিন্তু সুমনার মাথায় নোড়া মারলেন কেন?”

“ঘৃণায়।”

অঙ্কন: ইন্দ্রনীল ঘোষ